চাঁদমামা
অগাষ্ট ১৯৭৩
৭০ P
http://jhargramdevil.blogspot.com

Photo by: SURAJ N. SHARMA

পেটের গোলমাল?
সে আবার কি বাপু?
কোনদিন শুনিনিতো!
ডাবর
গ্রাইপ
ওয়াটার
প্রত্যেক মায়ের কাছে
তার শিশুর মতন প্রিয়
শিশুদের বদহজম, অম্বল, পেটব্যাথা, বায়ু, ও দাঁতউঠার সময় ব্যাথার একটি সুস্বাদু সুনিশ্চিত সমাধান
GRIPE
WATER
ডাবর (ডাঃ এস. কে. বর্ম্মন) প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-২৯

everest/508b/PP BN

চাঁদমামা

সংস্থাপক : বি. নাগি রেড্ডি
নিয়ন্ত্রণ : চক্রপাণি

মহাভারতের যুদ্ধের সমগ্র প্রস্তুতির পর যুধিষ্ঠির ভাবছেন যে তিনি কোন অধর্ম কাজ করতে যাচ্ছেন কিনা। মহাভারতের যুদ্ধের ফলে সামাজিক জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত হল। তার আগে জ্ঞাতি গোষ্ঠীর যুদ্ধ হওয়া অধর্ম হিসেবে গণ্য করা হত। কৃষ্ণ ঐ রীতি ভঙ্গ করতে চাইলেন। যুধিষ্ঠিরের পাশা খেলার সময় কৃষ্ণ সেখানে থাকলে তখনই যুদ্ধ শুরু হয়ে যেত। পাণ্ডবদের বনবাসের সময় কৃষ্ণ ব্যঙ্গ করে একথা বলেছিলেন। আর আছে বহু মজার মজার কাহিনী।

খণ্ড ২ আগস্ট ১৯৭৩ সংখ্যা ২
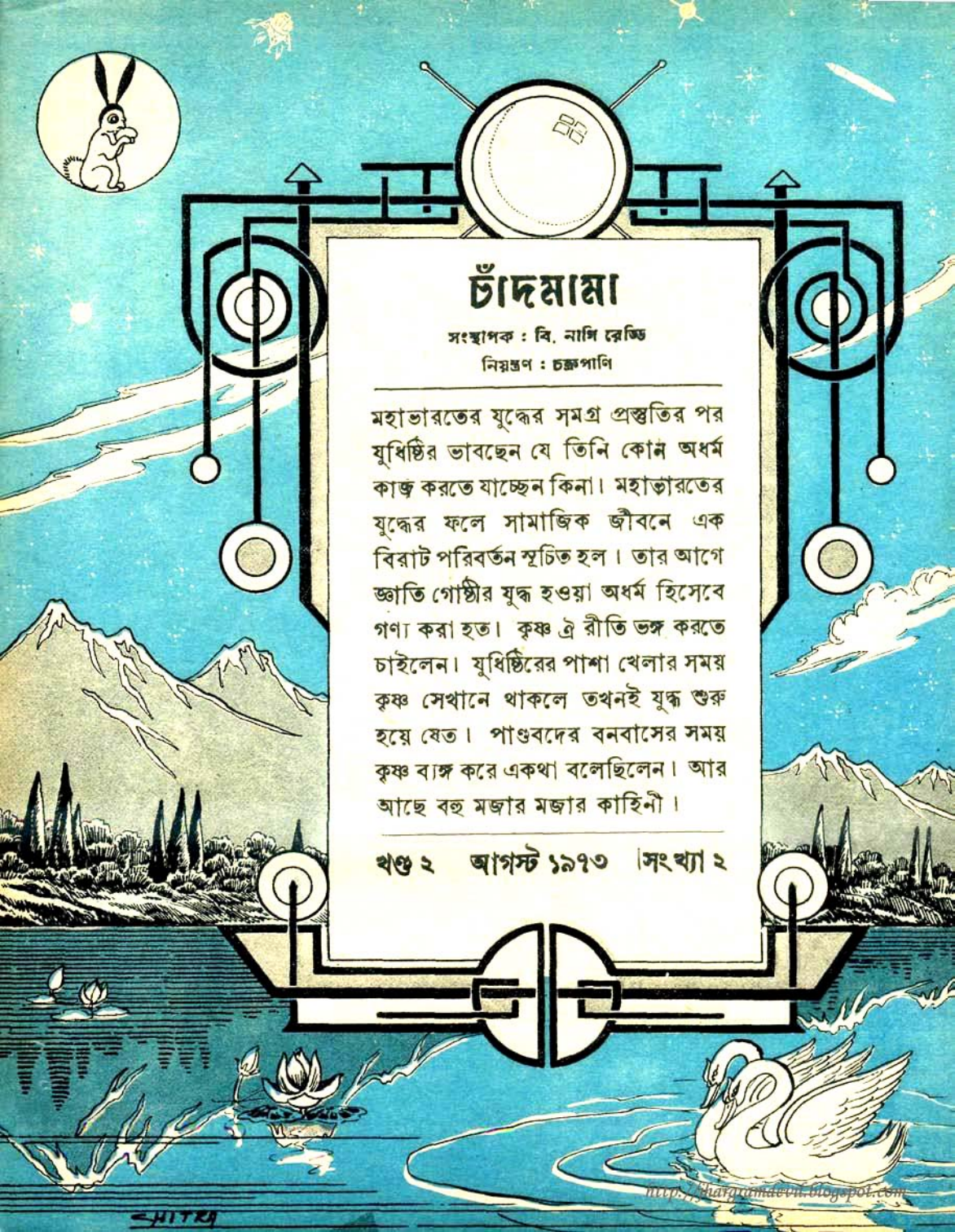
অমর বাণী

উদয়ে সবিতা রক্তাঃ,
রক্ত শ্চাস্তময়ে তথাঃ
সংপত্তৌ চ বিপত্তৌ চ,
মহতা মেকরূপতা। ॥ ১ ॥

[সূর্যকে উদয়ের সময় লাল দেখায় আবার অস্তের সময়ও লাল দেখায়। মহাত্মারা সম্পদের সময় ও বিপদের সময় একই রকম থাকেন।]

যথা চিত্তম্ তথা বাচঃ,
যথা বাচঃ তথা ক্রিয়াঃ,
চিত্তে বাচি ক্রিয়ায়াম চ,
মহতা মেকরূপতা। ॥ ২ ॥

[মন যেমন হয় কথাও তেমনি হয়ে থাকে। কথা যেমন হয়ে থাকে কাজও হয় তেমনি। মহাত্মাদের মন, কথা ও কাজ একই রকম হয়ে থাকে।]

মন স্যেকম্, বচ স্যেকম্
কর্মণ্যেকম্ মহাত্মনাম্,
বচ স্যন্যৎ, মনস্যন্যৎ
কর্ম ন্যন্যৎ দুরাত্মনাম্। ॥ ৩ ॥

[মহাত্মাদের মন, কথা ও কাজে মিল থাকে কিন্তু দুরাত্মাদের ওসবে কোন মিল থাকে না।]

মহাত্মা

বিচিত্র বিচার

এক গ্রামে কণকদাস ও কণকলক্ষ্মী নামে দম্পতি ছিল। কণকদাস টাকা রোজগার করতে ও জমাতে খুব ওস্তাদ ছিল। সে প্রত্যেক মাসে শত শত টাকা রোজগার করত। খরচ করত মাত্র দুটো টাকা। বাকি টাকা সিন্দুকে রেখে চাবি নিজের কোমরে বেঁধে রাখত। কণকলক্ষ্মী যতই অনুরোধ করুক, কাঁদুক সে তার বেশি এক পয়সাও বের করত না।

একদিন সকালে কণকদাস কোন একটা কাজে অন্য গ্রামে গেল। বেরুনোর আগে বউয়ের হাতে আধুলি রেখে বলল, "এটা খরচ করে তুমি এক বেলা খেয়ে নাও।"

কণকলক্ষ্মী আধুলিটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে সন্দেহের চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলল, "তাহলে রাত্রে কি খাব? রাত্রে কি আমাকে উপোষ করে থাকতে হবে?"

"আরে আমি সন্ধ্যে নাগাদ ফিরে আসব। রাত্রের খরচের পয়সা ফিরে এসে দেব।" কণকদাস জবাবে বলল।

"আর আট আনা দিয়ে গেলে কি ফতুর হয়ে যাবে। সিন্দুকে টাকা ভরে রেখেছ কিন্তু আমার হাতে দুপয়সা বেশি দিতে চাও না। মা-বাবা আর পাত্র পেল না, তোমার মত কিপটেকেই খুঁজে পেল।" বলে কণকলক্ষ্মী চোখ মুছল।

বউয়ের কথা কানে না তুলে কণকদাস হন্ হন্ করে নিজের কাজে চলে গেল।

কণকলক্ষ্মী মনে মনে স্বামীকে যা মুখে এল তাই বলল, বাজারে গিয়ে যা হোক কিনে রান্না করে খেয়ে নিল। খাওয়া শেষ

পঙ্কজলাল ব্যানার্জি

করে আঁচিয়ে ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই বাইরে থেকে ডাক শুনতে পেল। দরজা খুলে দেখে তার বাবা।

বাবা বাড়িতে পা রেখেই জিজ্ঞেস করল, "ভাল আজ তো মা ?" কণকলক্ষ্মী আগে থেকে মা বাবার উপর মনে মনে চটে ছিল। বাবার প্রশ্ন শুনে বলল, "এর সঙ্গে আমার বিয়ে না দিয়ে গলায় কলসী বেঁধে জলে ফেলে দিলেই পারতে। যার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছ ভাল থাকার উপায় আছে। সব টাকা ঐ সিন্দুকে রাখে। আমার হাতে কাণা কড়িও থাকে না। কোন আত্মীয়স্বজন এলে তাদের জন্য আমি কিছুই করতে পারি না।"

কণকলক্ষ্মী আরও অনেক কথা শোনাল বাবাকে।

কণকলক্ষ্মীর বাবা এসব শুনে অবাক হয়ে বলল, "মা, আমি তোমার ঘরে খেতে আসিনি। তুমি কেমন আছ জানতে এসেছি।" এ কথা বলে বাবা মাথা নিচু করে ভার মনে চলে গেল।

কড়া রোদে বাবার ফিরে যাওয়াতে, বাবাকে কিছু খাওয়াতে না পারায়, দুঃখে অভিমানে রাগে ফুলতে থাকে কণকলক্ষ্মী। সারা জীবনের রাগ যেন জমাট বাঁধতে থাকে। স্বামী বাড়ি ফিরলে আজ একটা বিহিত করে ছাড়বে।

সন্ধ্যার সময় কণকদাস বাড়ি ফিরে কোমর থেকে চাবি বের করে বলল, "আমি খেয়ে এসেছি। এখন তোমার জন্যই অহেতুক আট আনা খরচ করতে হবে।"

কণকলক্ষ্মী হঠাৎ তার স্বামীর চাবি গোছা কেড়ে নিয়ে গর্জে উঠে বলল, "এবার থেকে এই চাবির গোছা আমার কাছেই থাকবে। এবার থেকে আমি খরচ চালাব। ভরা দুপুরে কড়া রোদে তোমার শ্বশুর এসেছিলেন তাঁকে কিছুই খাওয়াতে পারিনি। লোকে শুনলে কি বলবে। তোমার না হয় লজ্জা ঘেন্না ভয় নেই, আমার তো আছে!"

কণকদাস রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলল, "টাকা খরচ করে ফেলা কোন বড় কাজ

নয়, বুঝলে। রোজগার করে কেউ আমার হাতে তুলে দিলে আমিও খরচ করতে পারি। দাও চাবি দাও বলে দিচ্ছি।"

"দেব না। কোন ক্রমেই দেব না।" কণকলক্ষ্মী দৃঢ়তার সঙ্গে বলল।

"কেন দেবে না? আমার টাকা খরচ করার তুমি কে?" বলে তার হাত থেকে চাবি কেড়ে নিতে চেষ্টা করে।

"কে মানে, আমি কি রাস্তার মেয়ে যে আমার অধিকার থাকবে না। তোমার টাকা খরচ করার অধিকার আমারও আছে। সব টাকা সিন্দুকে তুলে রাখার জন্য নয়! খরচও করতে হয়।" বলে সে চাবি নিয়ে সেখান থেকে সরে যায়।

তক্ষুনি ভুঁড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে সামনের বাড়ির বিরাট এক ব্যবসাদার এসে বলল, ঝগড়া করছ কেন?"

কণকলক্ষ্মী লোকটাকে সব কথা জানিয়ে বলল, "এবার আপনি বিচার করুন। আপনি যা বলবেন তাই মেনে নেব।"

"এই মরেছে, আমি তোমাদের ঝগড়া মেটাতে বিচার করতে বসব কোন দুঃখে। যাই।" বলে ব্যবসাদারটি নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

দু-চারটে বাড়ির পরে আছে ও পাড়ার মোড়লের বাড়ি। মোড়লের বউ জিজ্ঞেস করল, "ঝগড়া হচ্ছে কেন?"

কণকলক্ষ্মী তার কাছে ছুটে গিয়ে সমস্ত কথা শুনিয়ে বিচার করতে বলল।

মোড়লের বউ সব কথা মন দিয়ে শুনে শেষ কথায় ঘাবড়ে গিয়ে বলল, "ওমা, আমার কি ছাই কারো কোন ব্যাপার বিচার করার সময় আছে।" বলে সেও তাড়াতাড়ি কণকলক্ষ্মীকে বিদায় দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

আরও কিছু দূরে এক বৃদ্ধ বসে বসে ওদের বাড়ির দিকে তাকাচ্ছিল। ঐ বৃদ্ধের কাছে গিয়ে সব কথা শুনিয়ে বিচার করতে বলল কণকলক্ষ্মী ও কণকদাস।

আমি তোমাদের ঝগড়া কি করে মেটাব? স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া তো স্বয়ং

ভগবানই মেটাতে পারে না।" বলতে বলতে বুড়ো আকাশের দিকে মাথা তুলে তাকিয়ে চুপ করে গেল।

"ঠিক আছে চল ভগবানের কাছেই বিচার চাই।" বলে কণকলক্ষ্মী স্বামীর হাত ধরে টানতে থাকে। গেল মন্দিরে। পূজারী ছিল না। প্রদীপ জ্বলছিল।

স্বামীর হাত ধরে সোজা ঠাকুরের কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে বলে, "ঠাকুর, স্বামীর রোজগার খরচ করার অধিকার কি স্ত্রীর নেই? এ আমার স্বামী। আমার হাতে একটি পয়সাও দেয় না। একে ভাল করে বোঝাও ঠাকুর। আমার বিচার কর ঠাকুর।"

ঠাকুর তার কথার জবাবে কিছুই বলল না। তখন কণকদাস বলল, "ঠাকুর, হতে পারে এ আমার বউ, তাই বলে কি আমার খাটুনির পয়সা খরচ করতে পারে? ওর খাবার খরচের টাকা আমি তো দিয়ে থাকি। ঠাকুর, বিশ্বাস কর, আমার গিন্নী এক পয়সাও রাখতে পারে না। ভীষণ হাত খোলা মেয়ে-ছেলে। সেই জন্যই তাকে টাকা পয়সা দিই না। কণকদাস বক্তব্য পেশ করল।

ইতিমধ্যে পূজারী এসে সমস্ত ব্যাপার বুঝে নিয়ে বলল, "একেবারে ঠাকুরের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে এ সব কি হৈ চৈ আরম্ভ করেছ। যাও বাইরে যাও। এখন মন্দিরের দরজা বন্ধ করার সময় হয়ে এল। তোমরা শুনিয়েছ। ঠাকুর পরে ভেবে চিন্তে বিচারের রায় জানাবেন। এখান থেকে সর।" ওরা মন্দির থেকে বেরিয়ে এল।

তারা বাড়ি ফেরার পথে আবার ঝগড়া করতে লাগল। পথের লোক ওদের বলল, "তোমরা পথে ঘাটে ঝগড়া করছ কেন? যাও, বাড়ি যাও।"

বাড়ি ফিরেই স্বামী-স্ত্রীতে একেবারে থ বনে গেল। সিন্দুকের দরজা খোলা। কারা যেন সিন্দুক ভেঙ্গে টাকা পয়সা সোনা দানা সব ফাঁকা করে নিয়ে গেছে।

পাওয়া
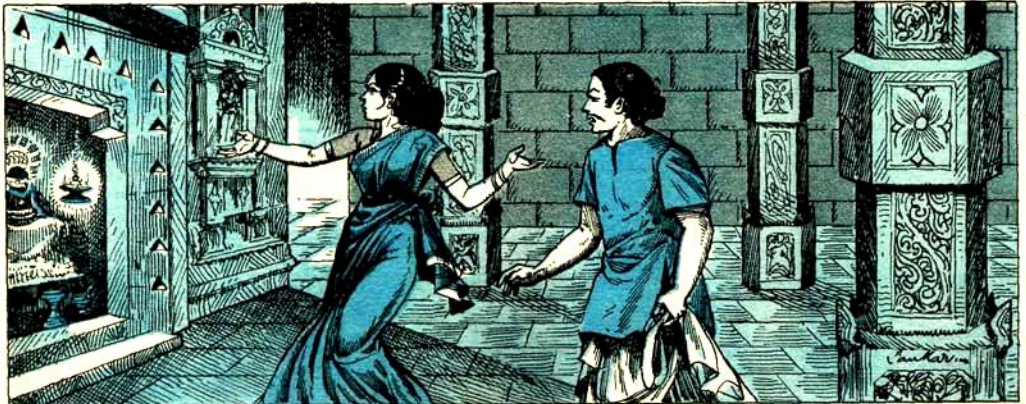
কোন এক গ্রামে অমর নামে এক গরিব চাষী ছিল। তার প্রথম সন্তান হল এক অন্ধ মেয়ে। অমর আর তার বউ তাদের এই দুর্ভাগ্যের জন্য ভীষণ দুঃখ পেল। ওরা ঐ মেয়ের নাম রাখল মল্লিকা।

মল্লিকার বয়স বারো বছর হতে না হতে অমরের মোট ছটি সন্তান হল। অমর আর পারছিল না সংসারের ভার বহন করতে। মল্লিকাও অন্ধ। সে কোন কাজেই সাহায্য করতে পারে না। একদিন অমর ও তার বউ যে কথা বলছিল তা হল ঃ আমাদের আর দিন চলছে না। এই অন্ধ মেয়েটাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করে কি হবে? ওর কোন দিনই বিয়ে হবে না। সারা জীবন আমাদের ঘাড়ে বসে খাবে। তার চেয়ে তাকে যদি কোথাও ছেড়ে আসি তাহলে তার ভাগ্যে যা আছে তাই হবে।

পরের দিন অমর মল্লিকাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। তার বুক ভার হয়ে রইল।

সেদিন সন্ধ্যায় তারা একটি গ্রামে পৌঁছাল। সেখানে একটা খাল ছিল। সেই খালে বর্ষাকাল ছাড়া অন্য সময় জল থাকত না। ঐ সময় খালে জল ছিল না। অমর ঐ খালে নেমে বসে কাপড়ের খুঁটিতে যে নিংড়ানো পান্তাভাত বেঁধে এনেছিল তা মেয়েকে খাওয়াল। পরে নিজে খেল। কাছে একটা পুকুর ছিল। সেই পুকুরের জল নিজে খেয়ে মেয়েকে খাওয়াল।

রাত্রে ওরা দুজনে ঐ খালেই ঘুমিয়ে পড়ল। ঠাণ্ডা হাওয়ায় ওরা দুজনে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

চন্দনা গুহ

সকালে উঠে অমর মল্লিকার দিকে তাকাল। ঐ মেয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। অমরের চোখ ছল্ ছল্ করে উঠল। সে মেয়েটাকে চুমু খেয়ে হন্ হন্ করে বাড়ির দিকে রওনা দিল।

কিছুক্ষণ পরে মল্লিকা জেগে উঠে 'বাবা' বলে চিৎকার করে উঠল। তার বাবা যে তাকে ছেড়ে চলে গেছে সে কথা সে ভাবতেই পারেনি। দু-চার বার ডেকে যখন সাড়া পেল না তখন ভাবল তার বাবা খাবার আনতে কোথাও গেছে।

হাত বাড়িয়ে বালি ঘেঁটে ঘেঁটে কয়েকটা পাথরের টুকরো বের করে খেলার জন্য গুছিয়ে রাখল। কিছুক্ষণ পরে তার মধ্যে চার পাঁচটা টুকরো কাছে রেখে বাকিগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিল। ঐ কটা দিয়ে সে খেলতে লাগল। অনেকেই খালের পাশ দিয়ে যাতায়াত করছিল। কিন্তু কেউ মল্লিকার দিকে তেমন কৌতূহলী হয়ে তাকাল না।

অমর মেয়ের কাছ থেকে যত দূরে যেতে লাগল তত তার মনে নানা প্রশ্ন জাগতে লাগল। বেচারি, মল্লিকা হয়ত জেগে উঠে আমাকে কাছে না পেয়ে কাঁদছে। কেঁদে কেঁদে হয়ত ভাসিয়ে দিচ্ছে। ছটা ছেলে মেয়ে যখন আছে তখন এই একটা মেয়েই কি আমার কাছে ভারি হয়ে গেল।

ভাবতে ভাবতে অমরের পাগুলো অবশ হয়ে গেল। পা আর সামনের দিকে এগোতে চাইছে না। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে মেয়ের কাছে এসে দেখে মেয়ে পাথরের টুকরো নিয়ে আপন মনে খেলা করে চলেছে। তার হাতের ঐ পাথর গুলোর মধ্যে একটা ছিল হীরা। হীরা জ্বলছে।

অমরের মন আনন্দে ভরে গেল। 'মা, মাগো, মা মল্লিকা!' বলে তাকে কোলে তুলে নিয়ে চুমো খেয়ে কোলে তুলে নিয়ে বাড়ি ফিরে গেল।
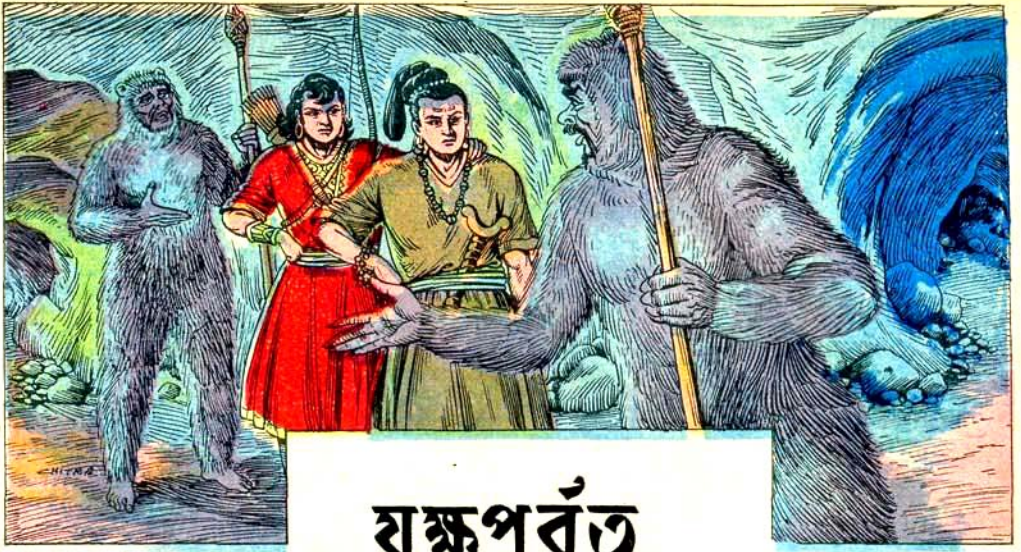
যক্ষপর্বত

তেরো

[সমরবাহু ও তার অনুচরকে ভালুক জাতের লোক গুহার ভিতরে নিয়ে গেল। খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত দেখতে পেল একটা জায়গা থেকে ধোঁয়া উঠছে। তারা ঐ ধোঁয়াকে অনুসরণ করে একটা গুহার ভিতরে যেতেই গুরু ভালুকের লোক তাদের ধরে ফেলল। নিয়ে গেল এক আস্তানায় যেখানে বহু নেকড়ে ছিল।]

সেই অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথ ধরে এগোতে এগোতে হঠাৎ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা।

সামনের লোকটা পিছনের লোকটাকে বলল, "ওরে ও ভাই এ ব্যাটারা নেকড়েদের আস্তানাকে একটা মজার জায়গা ভেবে বসে আছে। এর আগের বারে যাদের এনেছিলাম তারা তো নেকড়ের গর্জন শুনেই ভয়ে কেঁপে উঠেছিল। কিন্তু এই দুজনকে দেখলে মনে হয় এরা একটুও ভয় পায় নি। এদের ভাল করে দেখিয়ে দি নেকড়ের আস্তানা কী জিনিস।" তখন এদের পিলে চমকে যাবে।

দ্বিতীয় লোকটা খিঁচিয়ে উঠল, "এখানে অহেতুক আজেবাজে কথা ভেবে সময় নষ্ট করে কি লাভ? এদেরও শেষ পর্যন্ত

সেখানেই নিয়ে যেতে হবে। এরা নিজেদের চোখে না দেখে পারবেই না।” তখন সবাই টের পাবে নেকড়ে কী জিনিস।

“না, আমি বলছি প্রথমেই যদি আমরা এদের সেই ভয়ঙ্কর জায়গাটা দেখিয়ে দি তাহলে এরা ভীষণভাবে ঘাবড়ে যাবে।”

একথা বলে প্রথম লোকটা অন্ধকারে কিছুক্ষণ কি যেন খুঁজতে লাগল।

তারপর একটা কি যেন নাড়াল। তৎক্ষণাৎ একটা দরজা খুলে গেল।

সেই খোলা দরজা দিয়ে জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়ল ঘরে।

সেই জ্যোৎস্নার আলোকে খড়গবর্মা ও জীবদত্ত সুড়ঙ্গের ভিতরে কি আছে না আছে দেখে নিল। সুড়ঙ্গটা কেমন যেন খাড়া ও চওড়া। সোজা একটা পথ চলে গেছে। আবার ডাইনে বাঁয়েও দুটো পথ আছে। সেই পথগুলোও নজরে পড়ল খড়গবর্মা ও জীবদত্তের।

“খড়গবর্মা এটাকে খুব একটা ছোট খাট সুড়ঙ্গ বলে মনে হচ্ছে না। এই সুড়ঙ্গ ধরে এগোলে আমরা হয়ত একটা বিরাট অঞ্চল দেখতে পাব যা এই ভালুক জাতের লোক গঠন করেছে। এতে নিশ্চয় ওরা এমন সব জায়গা করে রেখেছে যাতে শত্রুর হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে।” জীবদত্ত বলল।

জীবদত্তের মুখ থেকে এই ধরণের কথা শুনে ভালুক জাতের একজন হেসে বলল, “তোমার দেখছি অনুমান করার অসীম ক্ষমতা আছে। এতে যে শুধু লোকজন লুকোতে পারে তাই নয় প্রয়োজন বোধে অনেক দিন লুকিয়ে থেকে বসে বসে খেতেও পারে। বহুলোকের খাবার মত খাদ্যের গোপন গোদামও অনেক আছে।”

খড়গবর্মা ও জীবদত্ত ওর কথা মন দিয়ে শুনছে দেখে লোকটা উৎসাহিত হয়ে বলল, কোন রকমে তোমরা যদি ঐ নেকড়েদের কাছ থেকে বেঁচে আসতে পার তাহলে বাকি জীবনটা তোমরা বেশ ভাল ভাবেই গুরু-ভালুকের সেবা করে কাটিয়ে দিতে পারবে।”

"আমরাও নেকড়েদের আস্তানাটা তাড়াতাড়ি দেখে নিতে চাই। ওটা যে কতখানি ভয়ঙ্কর জায়গা তা একবার নিজের চোখে না দেখে শান্তি পাচ্ছি না।" জীবদত্ত বলল।

তক্ষুনি ভালুক জাতের একটা লোক ঐ দরজা দিয়ে ঢুকে বেরুল। খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত বাইরের দৃশ্যটা একবার দেখতে পেল। ভালুক জাতের লোকটা যা বলেছিল তাই সত্য। জ্যোৎস্নার আলোকে তারা দেখতে পেল বহু নেকড়ে এক জায়গায় অস্থিরভাবে ঘোরাঘুরি করছে। বিরাট এক সমতল ভূমির মাঝখানে চোদ্দ পনের ফুট উঁচু এক পাহাড়ের উপরে দুটো বল্লম নিয়ে দুজন লোক যথাসাধ্য জোরে ধমক দিচ্ছে নেকড়েদের। আর নেকড়েগুলো গর্জন করতে করতে ঐ উঁচু পাহাড়ের অংশে উঠে ঐ দুজনকে টেনে নাবিয়ে ছিঁড়ে খেতে চাইছে।

"আচ্ছা ঐ দুজনের একজনকে দেখে, বিশেষ করে তার পোশাক দেখে মনে হচ্ছে না ও সমরবাহু?" জীবদত্ত বলল।

প্রশ্নটা খড়্গবর্মাকে করলেও একজন ভালুক জাতের লোক বলল, "আমরা জানি না ও কোন্ বাহু। তবে এটুকু জানি যে সূর্যোদয়ের আগে ওরা নেকড়েদের পেটে যাবে। তার পর তোমাদের দুজনকেও ঐ পাথরের উপর দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে। তোমাদেরও ঐ ওদের অবস্থাই হবে। তবে কোন রকমে যদি দেবী

ঋক্ষেশ্বরীর কৃপায় তোমরা বেঁচে যেতে পার তাহলে তোমাদের বাকি জীবন গুরু-ভালুকের সেবা করে সুন্দরভাবে কেটে যাবে।"

তার মুখের কথা শেষ হতে না হতেই জীবদত্ত তাকে ধমক দিয়ে বলল, "আরে বাবা, কথায় কথায় অত গুরুর নাম করছ কেন ? ঐ পাথরের উপর আমাদের রেখে দেওয়া হবে তো ? ভাল কথা। আমরা ঐ পাথরের উপরে যেতে চাই। আমাদের এক্ষুনি যেতে দাওনা কেন। আমরা নিজেরাই চলে যেতে পারি। তোমরা তোমাদের কাজে যাও।"
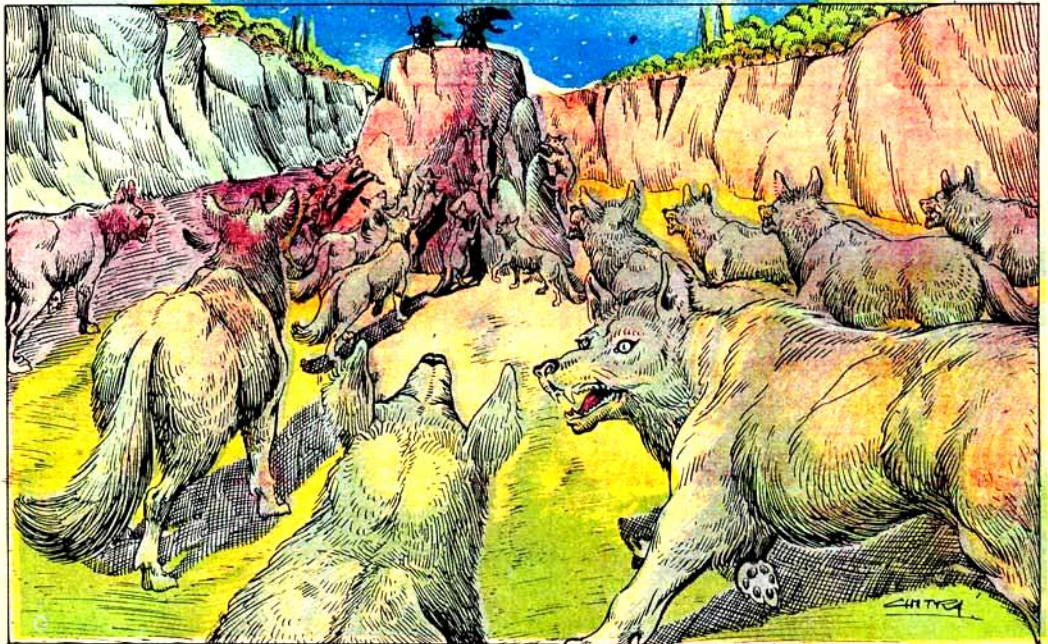
"অদ্ভুত কথা। এখান থেকে ঐ পাথরের উপরে যেতে হলে দরজার ওপার থেকে দশ ফুট নিচে লাফাতে হবে। তারপর নেকড়ের ভিতর দিয়ে হেঁটে গিয়ে ঐ পাথরের উপর উঠতে হবে। নেকড়েদের কাছে গেলে তোমরা আর প্রাণে বাঁচতে পারবে ? নেকড়েগুলো তোমাদের একেবারে ফেড়ে ফেলবে। চোখের পলকে তোমাদের দুজনকে খেয়ে শেষ করে ফেলবে।" ভালুক জাতের একজন বলল।

"বেশ ভাল কথা। এখন তোমরা কি ভাবে নিয়ে যেতে চাও বল ?" খড়্গবর্মা দৃঢ়তার সঙ্গে তাদের প্রশ্ন করল।

"আর একটা সুড়ঙ্গ পথ আছে। সেই পথ ধরে গেলে সোজা ঐ নেকড়েদের মাঝের পাথরের কাছে পৌঁছে যাবে। ঐ পথে না গেলে কোন উপায় নেই।" ভালুক জাতের লোক বলল।

"বেশ চলো। অযথা দেরি করে আর আজেবাজে কথা বলে সময় কাটানোর কি দরকার।" জীবদত্ত বলল।

তাদের কাছে মনে হল বেশি দেরি হলে সমরবাহু ও তার অনুচরকে নেকড়েগুলো শেষ করে ফেলবে। এবং তা যদি হয় তাহলে এত কষ্ট করে এই সুড়ঙ্গ পথে আসা অসার্থক হবে।

তারপর ভালুক জাতের লোক সুড়ঙ্গের উপরের দরজা বন্ধ করে দিল। কিছুদূর ওরা এগিয়ে গেল।

সেখানে সিঁড়ি দিয়ে তুলল খড়্গবর্মা ও জীবদত্তকে।

ওরা দেখতে পেল অদ্ভুত আলগা একটা পাথরের টুকরো। ঐ পাথরের সংলগ্ন এক সোনার ছড়ি ধরে ওরা জোরে টান মারল। পাথরটা নড়ে এক পাশে সরে গেল। ওরা সেখান থেকে দেখতে পেল সমরবাহু ও তার অনুচরকে। খুব কাছ থেকে তাদের এই প্রথম দেখা গেল ও পরিষ্কার চিনতে পারল।

পাথরটা সরার সময় যে আওয়াজ হল তা কানে যেতেই সমরবাহু আর্তনাদ করে উঠল, "ওরে চন্দু, পাথরের পেট থেকে নেকড়েগুলো উপরের দিকে উঠে আসছে!"

খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত উপরে উঠতে উঠতে বলল, "সমরবাহু, ভয় পেয়োনা। আমরা তোমার বন্ধু।"

খড়্গবর্মা ও জীবদত্তকে দেখে সমরবাহুর তো চক্ষুস্থির! কি যেন বলার চেষ্টা করল কিন্তু তার মুখে কোন কথা সরল না। ঐ পথটা পাথরের টুকরো দিয়ে বন্ধ করতে করতে ভালুক জাতের লোক বলল, "ও তোমরা তাহলে এক গোয়ালের গরু। তাহলে তো ভালই হল সবাই এক সঙ্গে নেকড়ের পেটে যাবে। বেশ মজা হবে!"

খড়্গবর্মা রক্তচক্ষু করে তার দিকে তাকাল কিন্তু তক্ষুনি ঐ পাথরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। জীবদত্ত সমরবাহুর কাঁধ চাপড়ে বলল, "সমরবাহু, ভয় পেয়ো না। স্বর্ণাচারির কাছে আমরা সব খবর পেয়েছি। সে আমাদের পুরোনো বন্ধু। এই মারাত্মক জায়গা থেকে নিরাপদে নিজেদের আস্তানায় ফিরে যাব। বিশ্বাস রাখ।"

"আমরা পৈত্রিক প্রাণটা নিয়ে এখান থেকে যেতে পারব! এ কি করে সম্ভব! এই পাথর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পথ তো ওরা পাথর চাপা দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে। আর এমনি নামতে গেলে তো নেকড়েদের পেটে যেতে হবে।" সমরবাহু নিরাশ হয়ে বলল।

"ঐ নেকড়ে আর আমাদের যারা বন্দী করেছে তারাই আমাদের পথ দেখাবে।

এই পাথরের চার পাশে দুর্গের প্রাচীর। উপরে আমরা চাঁদ দেখতে পাচ্ছি। সব দেখে শুনে মনে হচ্ছে এই অঞ্চলে ঢোকার দু-একটা সুড়ঙ্গ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই।" জীবদত্ত বলল।

"আপনার কথা বুঝলাম। কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না কি ভাবে, কোন্ কৌশলে আমরা এখান থেকে বেরিয়ে পালাতে পারব।" সমরবাহু বলল।

জীবদত্ত এই কথার জবাবে কি যেন বলতে যাচ্ছিল এমন সময় একটা নেকড়ে লাফিয়ে ওদের প্রায় কাছে এসে পড়ল। পাথরের খাঁজে একটা পা রেখে উপরে ওঠার আপ্রাণ চেষ্টা করছে ঠিক সেই মুহূর্তে খড়্গবর্মা তরবারি তুলে তার ঘাড়ে দিল একটা কোপ বসিয়ে। নেকড়ে ঐ এক কোপেই মাটিতে পড়ে রক্তাক্ত অবস্থায় গড়াগড়ি খেতে লাগল।

"খড়্গবর্মা, খুব ভাল কাজ সময় মত করেছ।" জীবদত্ত খড়্গবর্মাকে প্রশংসা করল। বলল, "বুঝলে সমরবাহু এই মরা নেকড়েটা আমাদের কাজে দেবে। আচ্ছা তুমি কি শুনেছ ওরা নেকড়েদের খেতে দেয় কখন?"

"ওদের মুখে শুনেছি, সূর্যোদয় অথবা সূর্যাস্তের সময় ওরা কোন জন্তুজানোয়ার মেরে ওদের সামনে ফেলে দেয়। তবে আজ আর ওদের সেই পরিশ্রম করার দরকার হবে না। কারণ আমাদের সবাইকে ছিঁড়ে খাবার পর নেকড়েদের আর খিদে থাকবে না।"

"খড়্গবর্মা আমরা প্রথমে যে সুড়ঙ্গ পথ দেখতে পেয়েছিলাম সেই পথ দিয়েই ওরা বোধ হয় খেতে দেয়।" জীবদত্ত বলল।

দূরে একটা দরজা দেখতে পেল খড়্গবর্মা। মাটি থেকে দশ ফুট উঁচুতে ছিল সেটা।

সেদিকে দেখিয়ে সে বলল, নেকড়েদের খাবার দেবার এটাই একমাত্র পথ আছে মনে হচ্ছে। কি ভাবছ? ভাল একটা পরিকল্পনা মাথা থেকে বের কর। তাড়াতাড়ি এখান থেকে বেরোতেই হবে।"

"গুরু ভালুক এমন একটা জায়গায় আমাদের পাঠিয়েছে যাতে কোন পথ দিয়েই আমরা বেরোতে না পারি। এবং এটাই ওদের আর ওদের গুরুর কাল হবে।" জীবদত্ত চারদিক তাকাতে তাকাতে বলল।

তারপর কারো মুখে কোন কথা নেই। সবাই চুপচাপ। রাত গভীর হয়েছে। কোন দিকে কোন সাড়া শব্দ নেই নেকড়েদের গর্জন ছাড়া। একজন বাদে বাকি সবাই ঐ পাথরের উপর ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোর হতেই নেকড়েদের গর্জন যেন হাজার গুণ বেড়ে গেল। চারদিকে ছড়ানো নেকড়েগুলো যে পথে খাবার দেয় সেই পথের দরজার দিকে ধেয়ে গেল।

নেকড়েদের গর্জন শুনে সবার ঘুম ছুটে যায়। জীবদত্ত খড়্গবর্মাকে ঐ পথ দেখিয়ে বলল, "আমরা যা ভেবেছিলাম সেটাই ঠিক। ভালুক জাতের লোকটা ঐ দরজা দিয়ে নেকড়েদের খাবার ছুঁড়ে দেবার আয়োজন করছে। তুমি তীর ধনুক নিয়ে প্রস্তুত থাক। লোকটাকে দেখা মাত্র তীর ছুঁড়বে।"

জীবদত্তের কথা মত খড়্গবর্মা তাক্ করে বসে রইল। সমরবাহু সে দৃশ্য দেখে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, "অতগুলো লোকের মধ্যে আমরা দুএকজনকে মেরে ওদের কোন ক্ষতি করতে পারব কি? আরো ঝামেলা বাড়বে। সবাই মারমুখী হয়ে যাবে। তখন আর কোন দিক দিয়েই পালানোর পথ
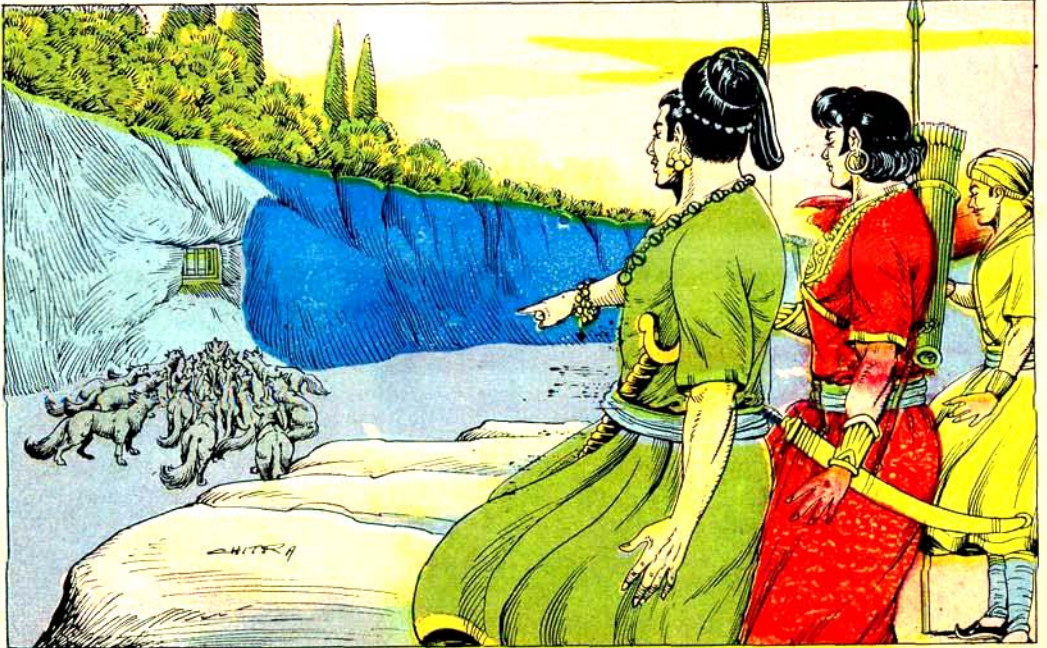
আমরা খুঁজে পাব না। ওরা আমাদের কাঁচা চিবিয়ে ফেলবে।"

সমরবাহুর সে কথা শুনে হাসতে হাসতে জীবদত্ত বলল, "সমরবাহু, এখন তো ওরা আমাদের নেকড়ের মুখে ঠেলে দিয়েছে। নেকড়েগুলো যাতে টেনে ছিঁড়ে খেতে পারে তার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। অপরাধীকে ঘৃণা করতে শেখ। ওদের বাঁচিয়ে রাখার অর্থ আমাদের মৃত্যু। মরার আগে মরিয়া হয়ে শেষ বারের মত কিছু করা ভাল নয় কি?"

জীবদত্তের কথা শেষ হতে না হতেই ভয়ঙ্কর এক আওয়াজ হয়ে দরজা খুলে গেল। ভালুক জাতের একটা লোক পশুর মাংস ভর্তি একটা ঝুড়ি এনে নেকড়েদের দিকে মাংস ছুঁড়ে দিতে লাগল। ঠিক তখনই জীবদত্তের ইশারা পেয়ে খড়্গবর্মা তীর ছুঁড়ল। তীর সোজা গিয়ে ভালুক জাতের একজনের মাথায় গিয়ে গভীর ভারে বিঁধল। সে আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। পরক্ষণে আর একজনও সুড়ঙ্গের পথে পড়ে গেল।

সারা সুড়ঙ্গে কোলাহল শুরু হয়ে গেল। বৃকেশ্বরীর সামনে পদ্মাসনে বসে ধ্যান করছিল গুরু ভালুক। আর্তনাদ আর কোলাহল শুনে চমকে উঠে বলল, "এ কিসের চিৎকার? কোলাহল কিসের? নেকড়েগুলো কি খেতে পায়নি? কাল যাদের পাথরে তুলে দেওয়া হয়েছে তারা কি বেঁচে আছে?"

"গুরু! গুরু সর্বনাশ হয়ে গেছে। ওরা তীর ছুঁড়ে আমাদের একজনকে মেরে ফেলেছে! ওদের কাছে আরও তীর আছে! এখন আমাদের কি হবে গুরু?"

গুরু ভালুক চোখ লাল করে বলল, "আমি বৃকেশ্বরীর শ্রেষ্ঠ ভক্ত! সাধারণ মানুষ কি করতে পারে আমার! ওদের সবাইকে আমি এক্ষুনি পঞ্চশূলের আহুতি করে দিচ্ছি।" বলে গুরু ভালুক সুড়ঙ্গ পথে এগিয়ে গেল। (আরও আছে)

জনতার শক্তি

বিক্রমাদিত্য ফিরে এলেন সেই গাছের কাছে। গাছে উঠে একটি শব কাঁধে নিয়ে গাছ থেকে নেমে নীরবে পথ চলতে লাগলেন।

ঐ সময় বেতাল বলল, "রাজা তোমার উদ্যমের প্রশংসা করছি কিন্তু আবার এও দেখা যায় যে চেষ্টা করে যে কাজ হয় না ভাগ্যের জোরে তা অনেক ক্ষেত্রে কার্যকরী হয়। কেকয়ের রাজা উপাহার বর্মার কাহিনী শুনলে আমার কথা যে সত্য তার প্রমাণ পাবে। শুনলে তোমার পরিশ্রমও কিছুটা লাঘব হবে।"

বেতাল কাহিনী শুরু করল: প্রাচীন কালে কেকয় দেশে শাসন করতেন রাজা উপাহার বর্মা। তিনি খুব শক্তিশালী রাজা ছিলেন। তাঁর সেনাবাহিনী ছিল

বেতাল কথা
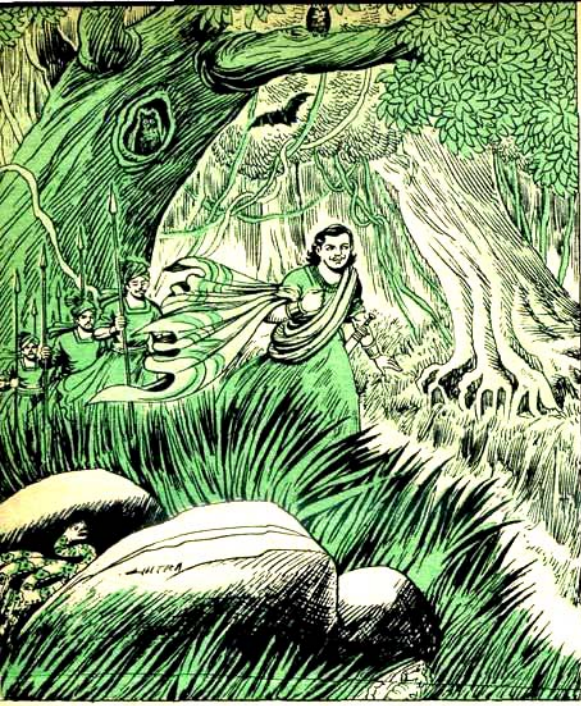
বিরাট। আবার ধন-সম্পত্তিও ছিল অগাধ। তাই, পাশের দেশের রাজা তার দেশের দিকে তাকাতেও ভয় পেতেন। কেকয় দেশের অধিবাসীরাও এমন রাজাকে পেয়ে গর্ব বোধ করত।

রাজা উপাহার বর্মার শত্রুভয় বলে কিছু ছিল না। কোন কিছুই তিনি পরোয়া করতেন না।

একবার কেকয় দেশের দক্ষিণাঞ্চলের কিছু প্রজা কিছুটা অরাজকতা সৃষ্টি করে ছিল। উপাহার বর্মা ঐ অরাজকতা দমন না করে ঘোষণা করলেন যে যদি ওরা রাজদ্রোহী হয় তাহলে তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে।

কিছুদিন পরে রাজা খবর পেলেন যে যারা অরাজকতা সৃষ্টি করেছিল তারা সব দল বেঁধে রাজধানী দখল করতে আসছে। রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাই তাদের উদ্দেশ্য। উনি ভাবলেন আসুক বিদ্রোহীরা আমার সেনাবাহিনী তাদের এক ফুৎকারে উড়িয়ে দেবে।

কিন্তু কার্যত তা হল না। বিদ্রোহীদের আক্রমণের তোড়ে রাজার সেনাবাহিনীই উড়ে গেল। রাজার বহু সৈন্য বিদ্রোহীদের হাতে মারা গেল। কিছু সৈন্য বিদ্রোহীদের দলে যোগ দিল। তারপর বিদ্রোহীদের নেতা রাজধানীতে ঢুকল।

নিরুপায় হয়ে রাজা উপাহার বর্মা কিছু ধন-সম্পত্তি ও বিশ্বাসী অনুচরদের নিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে গা ঢাকা দিলেন। পরক্ষণেই বিদ্রোহীদের নেতা সিংহাসন দখল করে রাজা হয়ে বসল।

বিদ্রোহীরা যখন উৎসব করছিল তখন রাজা গোপন পথে চন্দ্রভাগা নদী পেরিয়ে মদ্রদেশের রাজার কাছে গিয়ে আশ্রয় চাইলেন।

মদ্রদেশের রাজার সঙ্গে উপাহার বর্মার আগেই বন্ধুত্ব ছিল। তাই মদ্ররাজ বললেন, "আপনি নিশ্চয় থাকবেন এখানে। আপনি এত বিচলিত হচ্ছেন কেন? জয়-পরাজয় তো ভাগ্যের খেলা। আপনি আমার

সেনাবাহিনী নিয়ে গিয়ে নিজের রাজ্য উদ্ধার করতে পারেন।"

বন্ধুর কথা শুনে উপাহার বর্মার আত্ম-বিশ্বাস বাড়ল। তাঁর ধারণা হল তিনি এইভাবে বিদ্রোহীদের আক্রমণ করে নিজের রাজ্য উদ্ধার করতে পারবেন। এসব ভেবে মদ্রদেশের সেনা নিয়ে নিজের দেশের বিদ্রোহীদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করলেন।

কিন্তু যুদ্ধ চন্দ্রভাগা নদীর তীরেই সমাপ্ত হল। উপাহার বর্মা এগোতে পারলেন না। সেই যুদ্ধে এমন কি নিজের ঘোড়াও হারিয়ে কোন রকমে বন পথে প্রাণ বাঁচিয়ে পালালেন।

উপাহার বর্মার হাতে আর কিছুই রইল না। কানা কড়িও তার হাতে ছিল না। বহুদিন পায়ে হেঁটে ব্রহ্মবর্তে পেঁছালেন। ব্রহ্মবর্ত ছিল তখনকার দিনে একটা ছোট্ট রাজ্য। উপহার বর্মার তুলনায় সে দেশের রাজ্য ছিল নগণ্য। তা সত্ত্বেও উপাহার বর্মা সেই দেশের রাজার কাছে গিয়ে নিজের পরিচয় গোপন রেখে বললেন, "মহারাজ, আমি অনেক বড় বড় সেনা বাহিনী পরিচালনা করেছি। আমাকে আপনার বাহিনী চালনা করার অধিকার দিন, আমাকে আপনার সেনাপতি করে নিন।"

ব্রহ্মবর্তের রাজা আপত্তি করলেন না। উপাহার বর্মাকে নিজের বাহিনীর সেনাপতি করে নিলেন।

কিছুদিন পরে সিন্ধুদেশের সেনাবাহিনী যৈত্রযাত্রা করতে যাওয়ার পথে ব্রহ্মদেশের গ্রামে লুণ্ঠন করল। এতে রাজা ব্রহ্মদত্ত রেগে গিয়ে বললেন উপাহার বর্মাকে, "আমরা সিন্ধু দেশের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।"

তাঁর কথা শুনে উপাহার বর্মা অবাক হলেন। বুঝলেন অতবড় বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জয়ী হওয়া যাবে না। অতএব, তাঁর জীবনে আর একটা পরাজয় অপেক্ষা করছে।

রাজা ব্রহ্মদত্ত সেনাবাহিনীর মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ সঞ্চার করলেন। নিজে সেনা পরিচালনার দায়িত্ব পালন করতে এগিয়ে এলেন। যুদ্ধ অল্প সময়ের মধ্যেই শেষ হল।

সিন্ধু দেশের সেনাবাহিনী স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে তাদের উপর হঠাৎ কেউ আক্রমণ করতে সাহস পাবে। আর এরকম ভয়ঙ্কর আক্রমণ করবে। ব্রহ্মদত্তের সেনা-বাহিনী চটপট সিন্ধুসেনাদের তাঁবুতে আগুন ধরিয়ে দিল। যারা পালাতে গেল তাদের ধরে মেরে ফেলল। আর যারা ধরা দিল তাদের বন্দী করে রাখল। সিন্ধুদেশের সেনাবাহিনীর যৈত্রযাত্রা মারাত্মক পরিণতির মাধ্যমে ব্রহ্মদেশেই সমাপ্ত হল।

বিজয়ী রাজা ব্রহ্মদত্তের সানন্দে বিজয়-গৌরবে ফেরার সময় উপাহার বর্মা জিজ্ঞাসা করলেন, "মহারাজ, আমাদের এই অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে আপনি কিভাবে বিজয়ী হতে পারলেন? আমার কাছে বিষয়টি রীতিমত বিস্ময়ের। আজ আপনার কাছে আত্ম পরিচয় দিচ্ছি। আমি কেকয় দেশের রাজা উপাহার বর্মা। সামান্য সংখ্যক সেনার কাছে আমার বিরাট সংখ্যক সেনা পরাজিত হয়েছিল। আমাকে সিংহাসন ছেড়ে পালিয়ে যেতে হয়েছে।"

একথা শুনে রাজা ব্রহ্মদত্ত বললেন, "যুদ্ধ শুধ্ সংখ্যার উপর নির্ভর করে না। সেনাদের জয়ী হওয়ার মনোবলের উপরই নির্ভর করে।"

নিজের পরিচয় জানানোর পর উপাহার বর্মার আর ব্রহ্মদত্তের কাছে থাকতে ইচ্ছা করল না। তাঁর মন দেশের দিকে টানল। তিনি চললেন দেশের দিকে। চন্দ্রভাগা নদী পেরিয়ে মাটিতে পা রাখতে না রাখতেই সৈন্যরা তাঁর পথ আগলে জিজ্ঞেস করল, "কে তুমি?"

"তোমরা আমার পরিচয় জানতে চাইছ কেন ভাই?" উপাহার বর্মা বললেন।

"আমাদের রাজা আগন্তুকদের উপর কড়া নজর রাখতে বলেছেন।" একজন সৈনিক জবাব দিল।

"তোমাদের রাজা নবাগতকে এত ভয় করেন কেন ?" উপাহার বর্মা জিজ্ঞেস করলেন।

"আমাদের রাজা কপাল জোরে এই রাজ্য পেয়েছেন। আমাদের আগেকার রাজা উপাহার বর্মাকে অতর্কিতে আক্রমণ করে ইনি রাজা হয়েছেন। তাই এই রাজার ধারণা যে-কোন সময় সেই রাজা এসে হঠাৎ আক্রমণ করবেন। সিংহাসন কেড়ে নেবেন।" সৈনিক বলল।

উপাহার বর্মা ভেবে পেলেন না এখনও সেই জবরদখলী রাজা তাঁকে এত ভয় করে কেন!

কিছুক্ষণ ভেবে তিনি ঐ সেনাদের কাছে বললেন, "আমিই সেই উপাহার বর্মা। তোমাদের রাজা তো আমার সব কিছু কেড়ে নিয়েছে, আর আমাকে ভয় পাবার কি আছে। আমার তো আর কিছুই নেই। ব্যাপারটা আমার কাছে আজব ঠেকছে।"

হঠাৎ সেনারা তাঁর পায়ে পড়ে প্রণাম করে বলল, "মহারাজ, আমরা আপনাকে চিনতে পারিনি। আপনি তাড়াতাড়ি আমাদের দেশে ফিরে আসুন। তা না হলে আমরা ধনে-প্রাণে মারা যাবো।"

"আমি বেঁচে থেকেও মরার মত আছি। হারানোর জন্য আমার কাছে বাকি আছে শুধু নিজের প্রাণ। আমি মরি তো নিজের দেশে মরব। বাঁচি তো নিজের দেশে।" উপাহার বর্মা বলল।

তারপর সেনারা নিজেদের মধ্যে কথা বলাবলি করল। তাদের মধ্যে একজন সৈনিক নিজের পোশাক পরিয়ে নিজেদের শিবিরে নিয়ে গেল রাজা উপাহার বর্মাকে।

উপাহার বর্মার জন্য প্রয়োজন হলে জীবন দিতে প্রস্তুত এমন বহু লোককে পাওয়া গেল। গোপনে গোপনে প্রচার হয়ে গেল যে রাজা উপাহার বর্মা ফিরে এসেছেন।

দেখতে দেখতে সংগঠন গড়ে উঠল। গোপন সংগঠন। ঐ রাজাকে রাজপ্রাসাদের মধ্যেই একটা ছোট্ট দল অতর্কিতে আক্রমণ

করে হত্যা করল। পরক্ষণেই ঐ রাজার যারা ঘোর সমর্থক তাদের কারাগারে পুরে দেওয়া হল।

পরের দিন ঘটা করে উপাহার বর্মাকে সিংহাসনে বসানো হল।

বেতাল এই কাহিনী শুনিয়ে বলল, "রাজা, বিদ্রোহী-রাজা উপাহার বর্মাকে এত ভয় করত কেন? উপাহার বর্মা নিজের অত সৈন্য থাকা সত্ত্বেও কেন পরাজিত হলেন আর শেষে নিজের যখন কোন কিছুই ছিল না তখন কি করে সিংহাসন ফিরে পেলেন? আমার এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না দাও তাহলে তোমার মাথা এখনই ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।"

একথা শুনে বিক্রমাদিত্য বললেন, "পরাজিত হওয়ার পরেও দেশবাসীর দরদ ও সহানুভূতি হয়ত উপাহার বর্মার প্রতি ছিল। এর জন্য বিদ্রোহী রাজার কুশাসনও দায়ী হতে পারে। যাই হোক না কেন, বিদ্রোহীরাজা বুঝতে পেরেছিল যে দেশ-বাসীর মধ্যে বহুলোক রাজা উপাহার বর্মাকেই মনে মনে চায়। জনতার শক্তি সঠিক ভাবে প্রয়োগ করতে না পেরে দু দুবার রাজা উপাহার বর্মা পরাজিত হলেন। কিন্তু তৃতীয় বারে দেশের মানুষ নিজেদের জীবনের তাগিদে উপাহার বর্মাকে আবার সিংহাসনে বসাল। মনোবল কিভাবে যে বাড়াতে হয় তা উপাহার বর্মা ব্রহ্ম-দত্তের কাছে শিখেছিলেন। কারণ তিনি চোখের সামনে দেখতে পেলেন ব্রহ্মদত্তের সেনারা কিভাবে মাইনে করা সেনার মত না লড়ে নিজের দেশের জন্য জানপ্রাণ দিয়ে লড়েছে। কিভাবে ঐ রাজা তার সেনাকে উদ্বুদ্ধ করেছে।"

রাজার এই ভাবে মৌনভাব ভঙ্গ করার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল আবার গিয়ে ঝুলে পড়ল ঐ গাছে। (কল্পিত)

সোমদেবের ভাগ্য

রাজকুমার সোমদেব সমুদ্র যাত্রা করা কালীন সমুদ্রের তল দেশের একটি শিলাখণ্ডে আঘাত পেয়ে তার নৌকা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। শেষে একটা ডিঙ্গার মত কাঠ পেয়ে কোন রকমে সে তীরে আসতে পেরেছিল। নিজেই আসতে পারল অন্যেরা ভেসে গেল সমুদ্রের গভীরে।

দুদিন ঐ কাঠে ভাসতে ভাসতে অবশেষে একটা দ্বীপে উঠল। তার গায়ে লাগল সূর্যের কিরণ। শরীর গরম হল। সোমদেবের জ্ঞান আস্তে আস্তে ফিরে এল। জ্ঞান হবার পর সোমদেব বুঝল সে একা পড়ে আছে। শরীর খুব দুর্বল। নড়তে চড়তে পারছে না। কোন রকমে উঠে বসে এদিক ওদিক তাকাল। যে দিকে তাকায় আলুর ক্ষেত। সবুজের আস্তরণ। হাঁটতে গিয়ে সোমদেব মাথা ঘুরে পড়ে গেল। তার পর যখন জ্ঞান ফিরে এল তখন দেখে সে একটি বিছানায় শুয়ে আছে! তার পাশে একটা বল্লমধারী বিচিত্র মানুষ। তার চোখে মুখে অদ্ভুত কুটিল হাসি।

"আমি কোথায়?" সোমদেব বলল।

"আলুপুরের রাজা পাটুঙ্গা মহারাজের মহলে।" বলল ঐ বিচিত্র লোকটা।

সোমদেব হাত পা নাড়তে গিয়ে দেখল তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে।

আমাকে এভাবে বেঁধে রাখা হয়েছে কেন?" সোমদেব জিজ্ঞেস করল।

"পাটুঙ্গা মহারাজের নির্দেশে বেঁধে রাখা হয়েছে। তুমি বিনা অনুমতিতে ঢুকে পড়েছ। অনধিকার প্রবেশকারীকে

এ. সি. সরকার (জাদুকর)

যে দণ্ড দেওয়া হয় সেই মৃত্যুদণ্ড তোমাকে দেওয়া হবে।" লোকটা বলল।

নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে সোমদেব দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল। মণিদ্বীপের রাজকুমারীকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে বাড়ির সবাইকে নিয়ে সে সানন্দে বেরিয়ে ছিল। নৌকা যাত্রায় বেরিয়ে তার এই হাল হল। এখন মৃত্যুদণ্ড ভোগ করতে হবে। কি যে করবে ভেবে পাচ্ছে না। শেষে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

অনেকক্ষণ পরে একজন এসে তার বাঁধন খুলে দেবার চেষ্টা করতেই সোমদেবের ঘুম ভেঙ্গে গেল। তারপর সোমদেবকে নিয়ে একটা কারাগারে নিক্ষেপ করা হল।

"তুমি আমাকে এখানে আনলে কেন?" সোমদেব প্রশ্ন করল।

"আজ পর্যন্ত তুমি রোগশয্যায় ছিলে। এখন তোমার অসুখ সেরে গেছে। এখন তোমাকে বন্দী করা হল।" বলল লোকটা। অন্ধকার ঘরে পুরে দিয়ে তালা লাগিয়ে লোকটা চলে গেল। নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভাবতে ভাবতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল সোমদেব।

কিছুক্ষণ পরে মনে হল দেওয়ালে কে যেন ঠুকছে। সোমদেবও ঠুকল দেওয়ালে। তারপর দেওয়ালের ওপার থেকে দুবার ঠোকার আওয়াজ শোনা গেল।

সোমদেব দেওয়ালটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। কোথাও কোন ফুটো নজরে পড়ল না।

সোমদেব কোমর থেকে ছোরা বের করে দেওয়ালের একা টইট অনেক কষ্টে বের করে ফেলল। সেই ফুটো দিয়ে দেখতে পেল দেওয়ালের ওপারে আছে অপূর্ব এক সুন্দরী। চোখে মুখে চুলে রুক্ষ ভাব। পোশাকের অবস্থাও ঐ ধরণের। তাকে দেখে অবশ্য মনে হয় যে সে এক রাজকুমারী।

"কে তুমি?" সোমদেব প্রশ্ন করল।

"আমি হতভাগিনী। মণিদ্বীপের রাজকুমারী। কিন্তু তুমি কে বলত?" যুবতী প্রশ্ন করল।

তরুণীর কথা শুনে সোমদেব একদিকে যেমন দুঃখে কাতর হয়ে গেল তেমনি অন্য দিকে খুশীও হল। সেই তরুণীকে দেখে সোমদেবের আর কোন সন্দেহ রইল না যে সে মণিদ্বীপের রাজকুমারী হীরাবতী।

"আমি এক হতভাগা রাজকুমার। আমার নৌকা ঝড়ে জলে নয় পাথরে আঘাত পেয়ে ভেঙ্গেচুরে গেছে। তারপর ভাসতে ভাসতে এসেছি এই দেশে। আচ্ছা তুমিই বা এই বিচিত্র দেশে এলে কি করে?" সোমদেব প্রশ্ন করল।

"আমারও ঐ একই অবস্থা। আমারও নৌকা ভেঙ্গে গেছে। আমি আমার এক আত্মীয়ের সঙ্গে তার বাড়ি যাচ্ছিলাম। শেষে এক বিপর্যয়ের ফলে এখানে এসে পড়েছি। এই দেশের রাজার এক চোখ কানা। লোকটা কুঁজো। আমাকে দেখেই সে বিয়ে করতে চেয়েছিল। কিন্তু আমি রাজী হইনি। তার ফলে আমার এই অবস্থা। আমাকে এরা কারাগারে নিক্ষেপ করেছে। এরা যে আমাকে নিয়ে কি করবে আমি তা জানি না। যাই করুক আমার আপত্তি নেই। ঐ রাজাকে বিয়ে করার চেয়ে আমার মৃত্যু হোক ক্ষতি নেই।" হীরাবতী অশ্রুসজল চোখে বলল।

ঠিক তখনই কার আসার পায়ের শব্দ শোনা গেল। সোমদেব তাড়াতাড়ি ইট

রেখে ঐ ফুটো বুজিয়ে দিল। লোকাট খাবার এনে কারাগারের ঐ কোঠরে রেখে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে আবার সোমদেব ঐ ফুটো দিয়ে রাজকুমারীকে প্রশ্ন করল, "আচ্ছা, এই দেশের ব্যাপারে কোন কিছু জানা আছে।"

এই দেশে আসার পর রাজা আমাকে খুব খাতির করেছিল। যেখানে খুশী আমাকে যেতে দিল। ইচ্ছে মত ঘুরেছি ফিরেছি। এ দেশের সম্পদ বলতে একটাই আছে। তা হল আলু। এখানকার একমাত্র ব্যবসা আলুর। এখানকার আলু বিদেশে চালান যায়। আলু বিক্রি করে এরা যা
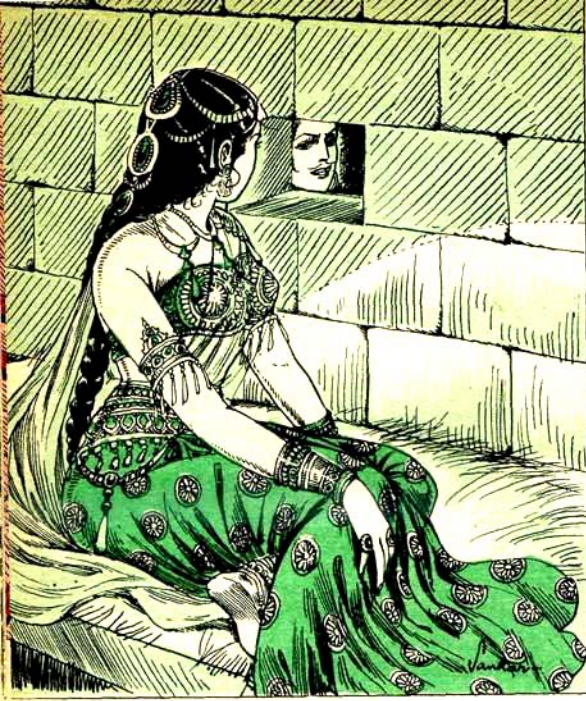
পায় তাই দিয়ে এদের চলে। ভালই রোজগার হয় এদের। এরা আলু ছাড়া আর কিছুই খায় না। আলুর নানান ধরণের তরকারি বানায়। অনেক রকমের আলুর রান্না এরা পারে। ইতিমধ্যে ঐ রান্না আশা করি খাওয়া হয়েছে।” বলল হীরাবতী।

“আমি এই দ্বীপে পা রেখেই দেখতে পেয়েছি শুধু আলুর ক্ষেত। সবুজের বাহার। আশ্চর্য সুন্দর দেখাচ্ছে এই দেশ। যোদকে তাকাই সবুজের মেলা। আমি একটা পরিকল্পনা করেছি। আমি এক বন্ধুর কাছে একটা জাদু শিখেছি। একটু সাহায্য করলে দুজনে এদের জোয়াল থেকে ছাড়া পেতে পারি।” বলল সোমদেব।

“আমাকে যা করতে বলা হবে তাই করব এখান থেকে মুক্তি পাবার জন্য।” বলল হীরাবতী।

“এবারে খাবার দিতে এলে লোকটাকে বলতে হবে, আমার মতের পরিবর্তন ঘটেছে। আমি আপনাদের রাজাকে বিয়ে করতে রাজী আছি। আমি আমার মতের পরিবর্তন করেছি। তবে আমাকে একটি মাস সময় দিতে হবে। একথা বললে রাজা আগের মত ঘোরার সুযোগ দেবে। যেখানে খুশী ঘোরার অবাধ স্বাধীনতা থাকবে। যা চাওয়া যাবে রাজা তাই দিতে রাজী হবে। তারপর দু-এক দিনের মধ্যেই আমার কাজ আমি শুরু করে দিতে পারব।” সোমদেব বলল।

রাজকুমারী সোমদেবের কথা মত কাজ করে কারাগার থেকে মুক্তি পেল। রাজা হীরাবতীকে ভীষণ ভালবাসতে লাগল। যা চাইত তাই দিতে রাজী হত। সোমদেবের চাহিদা অনুসারে রাজকুমারী তাকে একটু সোনা এনে দিল।

সোমদেব ঐ সোনা পাহারাদারকে উপহার দিয়ে বলল, “দেখ ভাই, আমাকে জল খাবার জন্যে যে গেলাস দিয়েছ সেটা খুব ছোট। আমার জন্য দুটো বড় বড়

কাঁচের গেলাস এনে দাও। তোমার পুণ্য হবে।"

সোমদেবের কথা শুনে পাহারাদার ধারণা করেনি যে তাতে কোন ক্ষতি হতে পারে। সে তাকে দুটো কাঁচের গেলাস এনে দিল। এছাড়া আরও দু একটা ফাইফরমাস খাটল ঐ পাহারাদার।

"তোমার দেশের আলু খুব সুন্দর। চমৎকার দেখতে তোমার দেশ।" সোমদেব বলল।

"তুমি ঠিকই বলেছ। আমাদের দেশে যে ধরণের আলু হয় সেই ধরণের আলু পৃথিবীর আর কোন দেশে হয় না।" পাহারাদার বলল।

"কিন্তু ব্যাপার কি জান, আমি ইচ্ছে করলে তোমার দেশের সমস্ত আলু নষ্ট করে দিতে পারি। আলু আমার কথা মত চলে। আমি যদি বলি আলু থেমে যা, আলু থেমে যাবে। আমি যদি বলি আলু মরে যা আলু মরে যাবে। আমি যদি বলি আলু হসনি, আলু হবে না। কাল আমি তোমাকে দেখাব। তুমি চোখ বড় বড় করে দেখবে আলু কেমন লক্ষ্মী ছেলেটির মত আমার কথা শোনে। তুমি ইচ্ছে করলে কাল তোমার রাজাকেও সপরিবারে আনতে পার। আমি তোমার রাজাকেও আমার কথা মত আলু চলে কিনা দেখাব।" সোমদেব বলল।
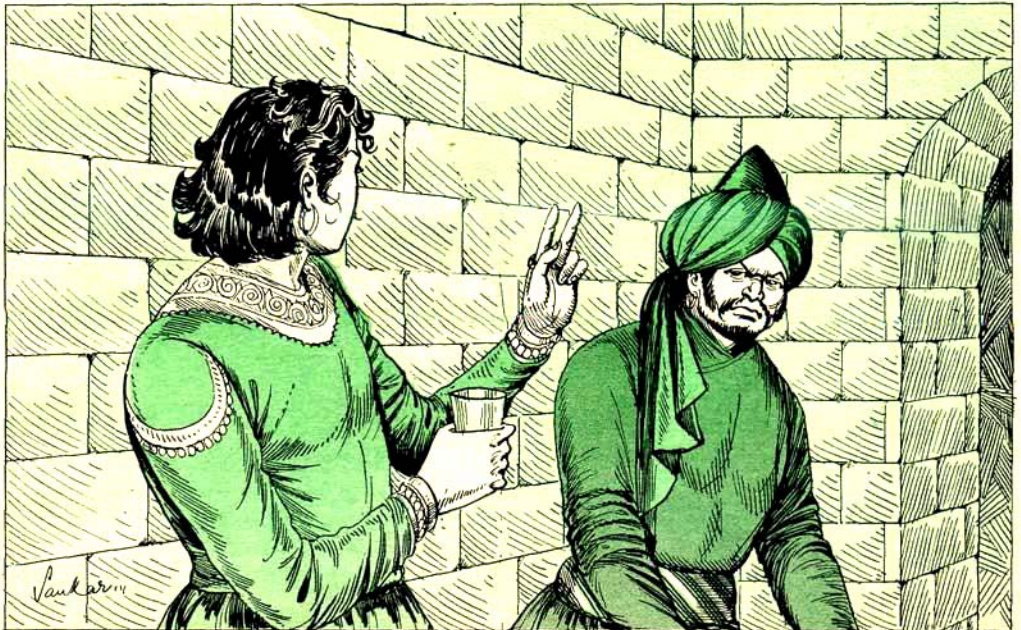
সোমদেবের কথা রাজার কানে যেতে বেশীক্ষণ লাগল না। পরদিন সকালেই রাজা কারাগারে চলে এলেন সোমদেবের ক্ষমতা দেখার জন্য।

সোমদেব প্রথমে খালি গেলাস দেখাল রাজাকে। রাজার সঙ্গে যারা ছিল তারাও দেখল। রাজার হাত থেকে আলু নিয়ে গেলাসের জলে আস্তে আস্তে ছেড়ে দিল। আলু আস্তে আস্তে গেলাসের নিচের দিকে নাবতে লাগল। আলু গেলাসের মাঝামাঝি আসতেই সোমদেব চিৎকার করে হুকুম করার মত বলল, "থেমে যাও।" আলু আর নিচে নাবল না। মাঝামাঝি জায়গায় থেমে গেল। প্রত্যেকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল চোখ বড় বড় করে। তারপর সোমদেব ওদের বলল, "আপনারা সচক্ষে দেখলেন আলু আমার কথা কত তাড়াতাড়ি শোনে। আমি মন্ত্র পাঠ করে আলুকে যা বলব আলু তাই করবে।" তারপর সোমদেব গেলাসটা হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে নাড়তে নাড়তে মন্ত্র পড়ার ভঙ্গিমা করে আলুকে নাবতে বলে। আলু গেলাসের নিচে নেমে যায়।

রাজা এ দৃশ্য দেখে আর কাল বিলম্ব না করে বলল, "ওরে কে আছিস। একে ছেড়ে দে। এ যা চায় তাই একে দিয়ে দে। এ লোকটা রেগে গেলে আমাদের আলুর সর্বনাশ করে দেবে। আর আলু না থাকলে আমরা মরে যাব।

কারাগার থেকে মুক্তি দিয়ে রাজার লোক সোমদেবকে প্রণাম করল। রাজা নমস্কার করে সোমদেবকে বলল, "আমাদের ক্ষমা করুন। আমাদের এখানে অতিথি হিসেবে যতদিন ইচ্ছে থাকুন। আমাদের অপরাধের জন্য ক্ষমা করুন। আপনি যা চান এখান থেকে নিয়ে যান।" রাজা গদ গদ কণ্ঠে বললেন।

তারপর রাজা সোমদেবকে পাল্কী করে নিয়ে গেল। বহু উপহার দিয়ে বলল, "আপনি আর কি চান বলুন। যা ইচ্ছে নিতে পারেন।"

"যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাকে দেশে ফিরে যেতে হবে। একটা ভাল নৌকা বানাতে হবে ব্যবস্থা করে দিন।"

তারপর সে হীরাবতীর দিকে ফিরে বলল, "তুমি কি চাও? তুমি কি রাজাকে বিয়ে করে এখানে থাকতে চাও?"

আজ্ঞে, আমি এই রাজাকে বিয়ে করতে চাই না। আপনার স্ত্রী হিসেবে আপনার সঙ্গে থাকতে চাই। আপনার সঙ্গে চলে যেতে চাই এখান থেকে।" হীরাবতী বলল।

এক সপ্তাহ পরে আলুপুর থেকে একটি নৌকা ছাড়ল। তাতে ছিল সোমদেব ও হীরাবতী।

জলপথে যেতে যেতে একদিন হীরাবতী সোমদেবকে প্রশ্ন করল, "আমি বুঝতে পারলাম না কেমন করে গোটা ব্যাপারটা ঘটে গেল। আমি তো শুধু একটু নুন দিয়েছিলাম। আর তো কিছু দিইনি। আলু থেমে গেল কি করে মাঝ পথে?"

"খুবই সহজ ব্যাপার। যে নুন চেয়েছিলাম তা জলে গুলে ফেললাম। জল গাঢ় নুন জল হয়ে গেল। অন্য একটা কাঁচের গেলাসে সাধারণ জল রেখে ছিলাম। অর্দ্ধেক জল। লোনা জল আস্তে আস্তে তাতে ঢাললাম। নোনা জল আস্তে আস্তে নিচে নেমে গেল। সাধারণ জল উপরে উঠে গেল। দুটো জলের সীমারেখার কাছে যখন আলুটা নেমে এল তখন আলুটাকে থেমে যেতে বললাম। অত ছোট আলু গাঢ় জলে নামতে পারল না। তাই সেটা লোনা জলে ভাসতে লাগল। তারপর মন্ত্র পড়ার ভান করে আস্তে আস্তে নেড়ে দিলাম। নোনা জল সাদা জল মিশে গেলে আলু নেমে গেল।" সোমদেব বুঝিয়ে বুঝিয়ে বলল।

সোমদেবের কথা শুনে রাজকুমারী হীরাবতী তার দিকে সপ্রেম দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।
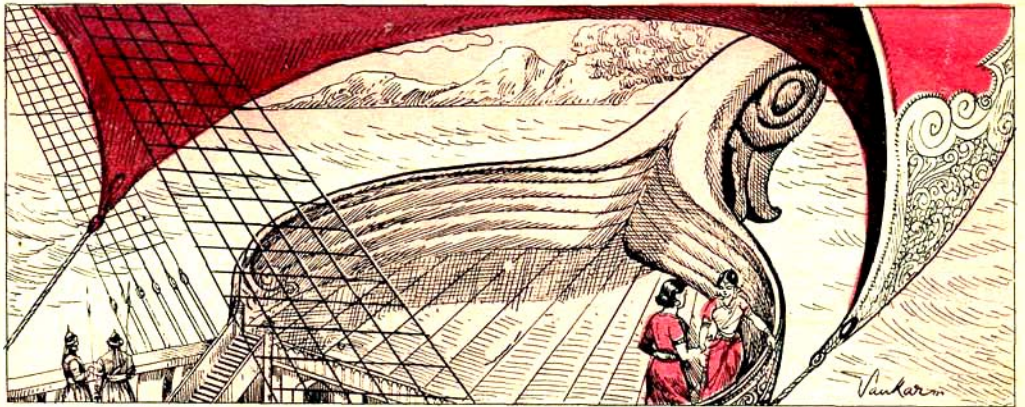
উচিত শিক্ষা

এক গ্রামে রাখাল নামে এক দুষ্টু ছেলে ছিল। পড়াশুনার নাম নেই সারাদিন ঘুরে বেড়াত আর যাকে তাকে ঢিল ছুঁড়ে মারত। একদিন এক পণ্ডিত মশাইকে ঢিল ছুঁড়ে মারল। পণ্ডিত মশাই ঘুরে দেখেন রাখাল দাঁত বের করে হাসছে!

পণ্ডিত কি যেন ভেবে নিয়ে রাখালকে হাসি মুখে কাছে ডেকে বললেন, "তোমার চমৎকার টিপ আছে তো! আমি খুব খুশী হয়েছি।" বলে তার হাতে চার আনা পয়সা দিলেন!

অত পয়সা হাতে পেয়ে রাখাল খুব উৎসাহিত হল। যখন তখন যেদিকে সেদিকে টিপ করে ঢিল ছুঁড়তে লাগল। হঠাৎ সে দেখতে পেল একটা মোটা-সোটা পয়সাওলা লোক ঐ পথে যাচ্ছে। রাখাল বেশ বড় একটা ঢিল তার দিকে ছুঁড়ে আগের মতই দাঁত বের করে হাসতে লাগল। লোকটা রাখালকে কাছে ডাকল। রাখাল চোখের পলকে তার কাছে গিয়ে হাত পেতে দাঁড়াল। লোকটা টেনে দুটো থাপ্পড় কষল রাখালের গালে।

ঐ থাপ্পড় খাওয়ার পর রাখাল আর কোনদিন ঢিল হাতে নেয়নি।

ছাগলের গান

সেকালের কথা। তখন ব্রহ্মদেশের রাজা ছিলেন এক সঙ্গীত রসিক মানুষ।

রাজা স্ফটিক শিলা দিয়ে এক সুন্দর মহল তৈরি করালেন।

ঐ মহলের পাশ দিয়ে যারা যেত তারা একবার ঐ মহলের দিকে অবাক হয়ে তাকাত। হাত দিয়ে ঐ মহলের দেয়াল ছুয়ে নিত।

এইভাবে দেয়ালে প্রত্যেকে হাত দিলে দেয়ালে দাগ পড়ে যাবে ভেবে রাজা পাহারার ব্যবস্থা করলেন। কেউ যেন দেয়ালে হাত না দেয়।

শীতকালে একজন সেপাই পাহারা দিচ্ছিল ঐ মহলে। খুব ঠাণ্ডা পড়েছিল সেই রাতে। সেপাই মনে মনে ভাবল, সবাই কেমন সুন্দর বিছানায় পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে, আর তাকে কাঁপতে কাঁপতে পাহারা দিতে হচ্ছে।

কিছুক্ষণ পরে আবার সেপাই ভাবল, এই সময় যদি আমি বিছানায় ঘুমাতাম আর রাজাকে এখানে, এই ঠাণ্ডায় পাহারা দিতে হত তাহলে বেশ হত। একথা সেকথা ভাবতে ভাবতে সে একটা কাঠ-কয়লার টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে চটপট দেয়ালে লিখে ফেলল ঃ

পয়সা যাদের পৃথিবী তাদের,
গরিব মানুষ কাঙাল পথের।

নিজের লেখা দেখে সেপাইয়ের খুব আনন্দ হল। একটা মনের কথা এত দিনে প্রকাশ্যে লিখে দিতে পেরেছে বটে। রাজা যে তাকে কেন পাহারা দিতে বসিয়েছেন তাও সে ভুলে গেল।

স্মরজিত কর

সকালে রাজকর্মচারিরা দেয়ালের লিখন পড়ে তো অবাক। তারা ছুটে গেল রাজার কাছে। জানাল ঐ লিখনের কথা। রাজা সেই রাতের পাহারাদারকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, "দেয়ালে ওসব আজেবাজে কথা কে লিখেছে ?"

"আমি লিখেছি মহারাজ। আমি মনে প্রাণে যা বিশ্বাস করি তাই দেয়ালে লিখে ফেলেছি।" সেপাই সাহসে বুক বেঁধে বলল।

"ও, তুমি তাহলে শুধু টাকা পয়সা চাও ?" রাজা জিজ্ঞেস করলেন।

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি টাকা পয়সা চাই।" সেপাই দৃঢ়তার সঙ্গে বলল।

"ঠিক আছে আমি চেষ্টা করব।" রাজা বললেন।

রাজার ছিল শত শত একর জমি। উদ্যানও ছিল বহু। তার একটি উদ্যানের একটি অন্ধকার কক্ষে সোনা আর রুপো ভরে দিয়ে সেপাইকে ঐ কক্ষে রাখার নির্দেশ দিলেন রাজা।

রাজার এই নিষ্ঠুর কাজ তাঁর মেয়ের নজরে পড়ল। রাজকুমারী ভাবতে লাগল কিভাবে সেপাইকে সাহায্য করবে।

ঐ নগরে একজন স্বর্ণকার ছিল। রাজকুমারী ঐ স্বর্ণকারের কাছে গোপনে গিয়ে তাকে সব কথা বলল। স্বর্ণকার ভেবে চিন্তে একটা পরিকল্পনা করল। ঐ কক্ষের

এক কোণে সিঁধ কাটল। ঐ জায়গা দিয়ে প্রত্যেকদিন সেপাইকে খাবার দিত স্বর্ণকার।

সেপাইয়ের উপর রাজার অত্যাচার যত বাড়তে থাকে তার প্রতি রাজকুমারীর দরদ তত বেড়ে যায়। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল স্বর্ণকারের সাহায্যে যে কোন ভাবে সেপাইকে মুক্ত করবে।

প্রত্যেক দিন কিছু কিছু সোনা ও রুপো ঐ সিঁধ কাটা জায়গা থেকে বের করিয়ে স্বর্ণকারকে দিল।

সেই সোনা রুপো দিয়ে একটা ছাগল বানাল। এমন ছাগল যা মধুর গান গাইতে পারে। শেষে ঐ ছাগলটাকে আরও বড় সিঁধ কেটে ঐ কক্ষে ঢুকিয়ে দিল। অন্ধকার ঘরে মনমরা হয়ে বসে থাকত সেপাই। তারপর থেকে সে ছাগলের গান শুনতে লাগল। তার মনও কিছুটা হাল্কা হল।

একদিন রাজা বেড়াচ্ছিলেন ঐ উদ্যানে। শুনতে পেলেন ছাগলের মধুর গান। রাজা ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না গান কোথা থেকে ভেসে আসছে।

পরের দিন রাজা রাজকুমারী ও মন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে এলেন ঐ উদ্যানে। সেদিনও রাজার কানে গেল সেই মন-মাতানো সুমধুর গান।

রাজা যে কোন দিন একটা সেপাইকে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন তা তিনি

একেবারে ভুলে গেলেন। গানের আওয়াজ ধরে ধরে রাজা ঐ কক্ষের কাছে গেলেন। কক্ষের দরজা খুলিয়ে দেখেন সেখানে একটা ছাগল রয়েছে।

রাজা সেই সোনা-রুপোর ছাগলটাকে প্রাসাদে নিয়ে গেলেন। ছাগলের ভিতরের যন্ত্রপাতি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে চাইলেন। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও ছাগলের ভিতরের যন্ত্রপাতি দেখা সম্ভব হল না। তখন ডাক পড়ল স্বর্ণকারের। স্বর্ণকার এসে সব খুলল। রাজা দেখলেন ছাগলের পেটে একটা যুবক! রাজা চমকে উঠে প্রশ্ন করলেন, "কে তুমি ?"

"মহারাজ, আমি একদিন লিখেছিলাম :

পয়সা যাদের পৃথিবী তাদের,

গরিব মানুষ কাঙাল পথের।

কিন্তু এতদিন পরে আমার সেই ধারণা বদলে গেছে।"

রাজা তার পিঠে চাপড় মেরে জিজ্ঞেস করলেন।

"তাহলে এখন তোমার ধারণা কি।"

"জীবনে দ্বিতীয় মহৎ বিষয় হল, বিপদে বন্ধুকে সাহায্য করা।" সেপাই বলল।

"দ্বিতীয়টি তো শুনলাম। কিন্তু প্রথমটি বললে না তো!" রাজার প্রশ্ন।

"এই জগতে একজন পুরুষের পক্ষে প্রথম প্রয়োজন একজন নারীর গভীর ভালবাসা।" সেপাই সলজ্জ দৃঢ়তায় বলল।

একথা শুনে রাজকুমারীর চোখ মুখ কান লজ্জায় লাল হয়ে গেল।

রাজা রাজকুমারীর দিকে তাকিয়ে অনুমান করলেন যে তাঁর মেয়ে সেপাইকে ভালবাসে।

পরক্ষণেই রাজা মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করলেন। জাঁকজমক সহকারে রাজকুমারীর বিয়ে হল ঐ সেপাইয়ের সঙ্গে।
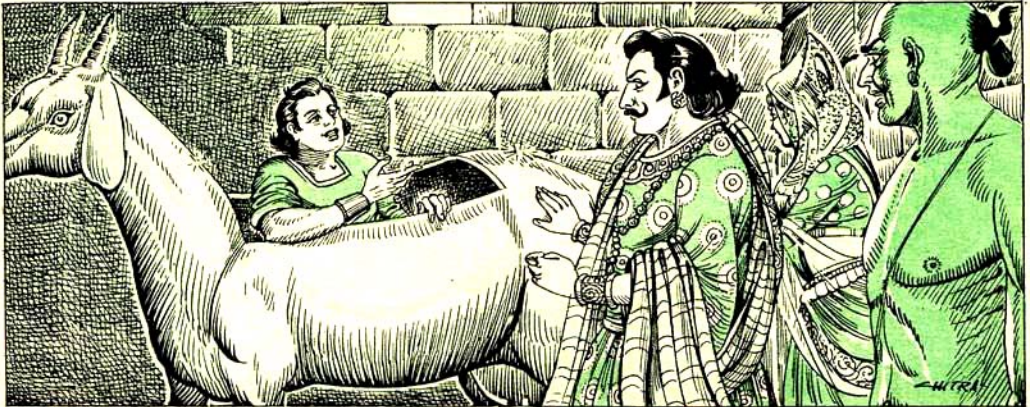
লোভীর ওষুধ

রামপুরে কৃষ্ণদাস নামে এক সুদের কারবারী ছিল। গ্রামের বহু লোককে ধার দিয়ে তাদের একেবারে ফতুর করে ছিল। যারা ফতুর হল তারা আর কৃষ্ণদাসের কাছে ঘেষত না। আর তেমন কেউ তার কাছে ধার নিতে আসত না।

কৃষ্ণদাস যা রোজগার করেছিল তা দিয়ে তার তিন পুরুষ বসে বসে খেতে পারে। কিন্তু কৃষ্ণদাসের ভাবনা হল চতুর্থ পুরুষ খাবে কি করে। চিন্তার মত রোগ নেই। ফলে কৃষ্ণদাস দিনের পর দিন রোগা হয়ে যেতে লাগল। বহু বৈদ্য তার চিকিৎসা করল কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। পরে তার এক আত্মীয় তাকে বলল, "কৃষ্ণদাস তুমি সারা জীবন পরের ধনসম্পত্তি নিয়ে বহু লোককে পথের ভিখারী করেছ। তুমি যদি প্রত্যেকদিন তোমার গ্রামের একজনকে কিছু দান কর তাহলে তোমার রোগ সেরে যাবে।

কথাটা মনে ধরল। সে পাশের বাড়ির রামদাসকে বলল, "রামদাস, আমার বাড়িতে আজ তোমার পরিবারের সবাই খাবে। নিমন্ত্রণ জানাচ্ছি।"

"মশাই, আজ আমাদের দুবেলা খাওয়ার মত খাদ্য আছে। আপনি এমন লোককে খাওয়ান যার আজকের খাদ্য নেই।" রামদাস আরও বলল, "কালকের খাওয়ার চিন্তা কাল করব। কালকের জোগাড় কাল হবে।" বলে রামদাস চলে গেল। ওর কথা শুনে কৃষ্ণদাস অবাক হয়ে গেল। তার মনে প্রশ্ন জাগল, "রামমদাসের মত গরিব লোক যখন কালকের খাবারের চিন্তা করছে না তখন সেই বা চতুর্থ পুরুষের খাবারের চিন্তা করবে কেন?" তার পর থেকে কৃষ্ণদাস প্রত্যেকদিন খাওয়াতে লাগল। ফলে তার রোগ সম্পূর্ণ সেরে গেল।

বিচিত্র পরীক্ষা

এক রাজার দুই রাণীর দুই পুত্র ছিল। কয়েক বছর পরে বড় রাণী মারা গেল। রাজার দুই ছেলে বড় হতে লাগল। ছোট রাণী অনুমান করল যে রাজা বড় রাণীর ছেলেকেই যুবরাজ করার তালে আছেন। তা যাতে না করতে পারেন তার জন্য অনেক ভেবে ছোটরাণী তাঁকে বলল, "বড় রাজকুমারকে রত্নগিরির রাজকুমারীর সঙ্গে যাতে বিয়ে হয় তার জন্য পাঠিয়ে দিন। রাজকুমারীকে বিয়ে করেই যেন সে তাড়াতাড়ি ফিরে আসে।"

রত্নগিরির রাজকুমারীকে বিয়ে করতে গিয়ে আজ পর্যন্ত কোন রাজকুমার ফিরে আসতে পারেনি। তা জেনেও ছোট রাণীকে খুশী করার উদ্দেশ্যে রাজা বড় ছেলেকে পাঠাবেন ঠিক করলেন।

বড় রাজকুমার রত্নগিরির রাজকুমারীর কথা শুনে ছিল। তবু সে সাহসে বুক বেঁধে রওনা দিল রত্নগিরির দিকে।

রত্নগিরি রাজ্যে ঢুকে রাজকুমার এক সরাইখানায় থেকে রাজকুমারীর ব্যাপারে খোঁজ খবর নিল। জানতে পারল যে রাজকুমারী যে পানীয় দেয় ঐ পানীয় খেয়ে রাজকুমারগণ পাথর বনে যায়। ঐ পাথরের মূর্তিগুলো সুড়ঙ্গে ফেলে রাখা হয়।

সরাইখানার লোক জানতে পারল যে প্রশ্নকর্তা একজন রাজকুমার। ঐ দেশের রাজকুমারীকে বিয়ে করতে এসেছে। তারা তাকে বলল, "বাবা, অহেতুক তুমি কেন পাথর হতে যাচ্ছ? তার চেয়ে অন্য কোন রাজকুমারীকে বিয়ে করে সুখে থাক না কেন?"

তুষার মজুমদার

কিন্তু রাজকুমার তাদের উপদেশে কান দেয় নি। রাজকুমারী সম্পর্কে লোকের মুখে যা শুনল রাজকুমারের কাছে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হল না। জেনে শুনে রাজকুমাররা কেন ঐ পানীয় পান করে ? কেন সমস্ত রাজকুমারকে পাথরের মূর্তি বানায় ? কার নির্দেশে হয় এসব ? এই ধরণের **প্রশ্ন** রাজ-কুমারের মগজে তোলপাড় করতে লাগল। রাজকুমার মনে মনে ঠিক করল এই সব প্রশ্নের সঠিক সমাধান যতদিন না পাচ্ছি ততদিন আমি নিজের রাজ্যে ফিরে যাব না। ভেবে চিন্তে সব ঠিক করে নিয়ে রাজকুমার সোজা গেল রত্নগিরির রাজকুমারীর কাছে। বলল, "আমি তোমায় বিয়ে করতে এসেছি।"

"আমাকে বিয়ে করার আগে একটা রাক্ষসের মুণ্ডু কেটে আনুন। ঐ রাক্ষস কোথায় আছে কিভাবে আছে সব বিস্তারিত ভাবে বলছি। মন দিয়ে শুনতে হবে। সাত সমুদ্রের ওপারে একটা নীল পাহাড় আছে। ঐ পাহাড়ের একটা গুহা দিয়ে সব সময় ধোঁয়া বেরোয়। ঐ গুহার ভিতরে ঢুকে এগিয়ে গেলে একটা রাক্ষস দেখতে পাওয়া যাবে। ঐ রাক্ষসের মুণ্ডু কেটে আনতে হবে। ঘুমন্ত অবস্থায় রাক্ষসের মুণ্ডু কাটা যায় তবে ওর প্রাণ আছে একটা টিয়াপাখির মধ্যে। ঐ টিয়া থাকে অন্য পাহাড়ে। ঐ পাহাড়ের পূব দিকে একটা লাল পাহাড় আছে। ঐ
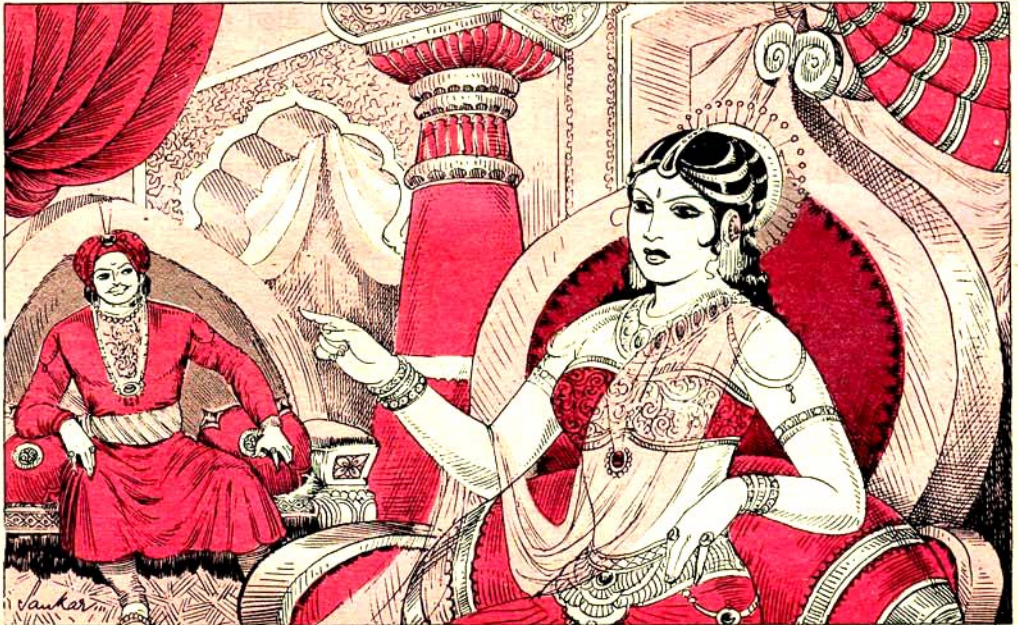
পাহাড়ের একটা গাছের খোপে ঐ টিয়া থাকে। ঐ টিয়ার গলা কেটে দিলেই রাক্ষস মারা যাবে। তারপর রাক্ষসের মুণ্ডু কেটে আনতে হবে।" রাজকুমারী বলল।

"আমি নিশ্চয় আনতে পারব।" রাজ-কুমার বুক টান করে বলল।

"তাহলে আপনি একটা পানীয় খেয়ে যান। আপনাকে যে কাজ করতে বলেছি সেই কাজ করার ক্ষমতা যদি আপনার মধ্যে থাকে তাহলে এই পানীয় খেয়ে আপনার কোন ক্ষতি হবে না। আর যদি তা না থাকে পাথর বনে যাবেন। সুড়ঙ্গে ফেলে রাখা হবে।" রাজকুমারী বলল।

রাজকুমার ঐ পানীয় পান করতে রাজী হল। রাজকুমারীর দেয়া পানীয় রাজকুমার সানন্দে গ্রহণ করে পান করে নিল। কিন্তু রাজকুমার পাথর হল না।

"কোই আমি তো পাথর হই নি। তাহলে আমি ঐ কাজের উপযুক্ত। চলি নিজের কাজে।" একথা বলে রাজকুমার উঠে দাঁড়াল।

"যেতে হবে না কোথাও। পরীক্ষা নেওয়া হয়ে গেছে। রাক্ষস আর টিয়ার গল্প আমার কল্পিত। আমার কথামত কাজ করতে যে বীর প্রস্তুত থাকে তাকেই বিয়ে করতে আমি প্রস্তুত। যাদের আমি আজ পর্যন্ত এই পানীয় দিয়েছি কেউ তা পান করে নি। সবাইকে সুড়ঙ্গে বন্দী করে রেখেছি।" রাজকুমারী বলল।

তারপর বেশ ঘটা করে বিয়ে হল ঐ রাজ-কুমারের সঙ্গে রাজকুমারীর। বিয়ে করতে আগে যে সব রাজকুমার এসেছিল তাদের সবাইকে মুক্তি দেওয়া হল। রাজকুমারীকে নিয়ে রাজকুমার রত্নগিরি থেকে ফিরে গেল নিজের রাজ্যে। রাজা খুশী হলেন। ছোট রাণী ভীষণ দুঃখ পেল। রাজা বড়রাণীর পুত্র, রত্নগিরির রাজকুমারীকে বিয়ে করে আনা বীর রাজকুমারকেই সিংহাসনে বসালেন।

লেখাপড়ার বড়ি

প্রাচীনকালে কোন এক গ্রামে ছিলেন এক পণ্ডিত। লোকটা নামেই পণ্ডিত। লেখাপড়ার নামে ঢুঢু। অথচ তার ইচ্ছা জাগল লেখাপড়ার ব্যবসা করবে। নিজেকে পণ্ডিত হিসেবে প্রচার করতে হবে। প্রচারের কাজে সুবিধার জন্য সে অনেকগুলো বই কিনে সাজিয়ে রাখল। মাত্র পাঁচ ছটা বই নিয়ে ছাত্র পড়াত। অন্য বইগুলো নিজেই পড়েনি তা অন্যদের পড়াবে কি করে।

কিন্তু প্রত্যেকদিন অনেক ছাত্র আসে, তার কাছে পড়ে যায়, অতএব ক্রমশ লোকের কাছে পণ্ডিত হিসেবেই প্রচারিত হতে লাগল। কেউ তাকে বলে পণ্ডিত। আর যারা ছাত্রজীবন থেকে দেখে আসছে তারা তাকে যেন কোনক্রমেই পণ্ডিত বলতে রাজী নয়। ছাত্ররা পণ্ডিত মশাইকে কলাটা মূলোটা দিতে লাগল। পণ্ডিত-মশাই নামেই সে পরিচিত হয়ে উঠল।

একবার রামানন্দ নামে এক ছাত্র তার কাছে পড়তে এল। ছেলেটি বুদ্ধিতে ছিল প্রখর। ওরকম মেধাবী ছাত্র তার আগে ঐ পণ্ডিতের কাছে কেউ আসেনি। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই ছাত্রটি বুঝতে পারল যে তার পণ্ডিত মশাইয়ের বিদ্যের দৌড় বেশি নয়। ছাত্রজীবনে শেখা বুলি গুলোই আওড়াচ্ছেন। রামানন্দ কয়েক দিনের মধ্যেই পণ্ডিত মশাইয়ের ঐ পাঁচ-ছটা বই পড়ে শেষ করে ফেলল। রামানন্দ আরও পড়তে চায় অনেক বই। কিন্তু পণ্ডিত অন্য বই দিতে চায় না। পণ্ডিত তাকে গুছিয়ে রাখা বইগুলোতে কাউকে

নরেশ কর্মকার

হাত দিতে দিত না। ফলে রামানন্দের জ্ঞান পিপাসা মিটত না। আরও বাড়ত।

রামানন্দের মত মেধাবী ছাত্র পেয়ে পণ্ডিত মশাইয়ের হয়েছে এক সমস্যা। ছাত্রদের যা বলে রামানন্দ তা মনে রাখে। বইয়ের কথা মুখস্ত করে, আবার বইয়ের বাইরে পণ্ডিত মশাই যা বলে তাও রামানন্দ ভোলে না। একবার যা শোনে তা মনে গেঁথে রাখে। যে কোন মূর্খ-পণ্ডিতের পক্ষে রামানন্দের মত ছাত্র একটি সমস্যা।

পণ্ডিত ভাবতে থাকে এতখানি বুদ্ধি রামানন্দের হয় কি করে! নিশ্চয় এর পিছনে কোন রহস্য আছে। কোন কিছু না থাকলে কিছুতেই এত চটপট সব কিছু শিখে ফেলতে পারে না। পণ্ডিত ছাত্রদের গোপনে বলল, "তোমরা রামানন্দের উপর গোপনে নজর রাখো তো। ও কোথায় যায় কি করে সব দেখে আমাকে জানাবে।"

সকালে ছুটির পর রামানন্দ কাছের বনে যায়। গাছের কাছে দাঁড়িয়ে নিজের পড়া মুখস্ত করে। দুপুরে রুটি খেয়ে জল খায়। ছাত্ররা দূর থেকে রামানন্দকে অনুসরণ করে পণ্ডিতের কাছে এসে বলল, "পণ্ডিতমশাই, রামানন্দ মন্ত্র পড়ে আর কি যেন চিবিয়ে চিবিয়ে খায়।"

মূর্খ-পণ্ডিত ভাবল, এবার ঠিক ধরা পড়বে। রামানন্দের বুদ্ধি গজিয়ে ওঠার রহস্য ভেদ করব।
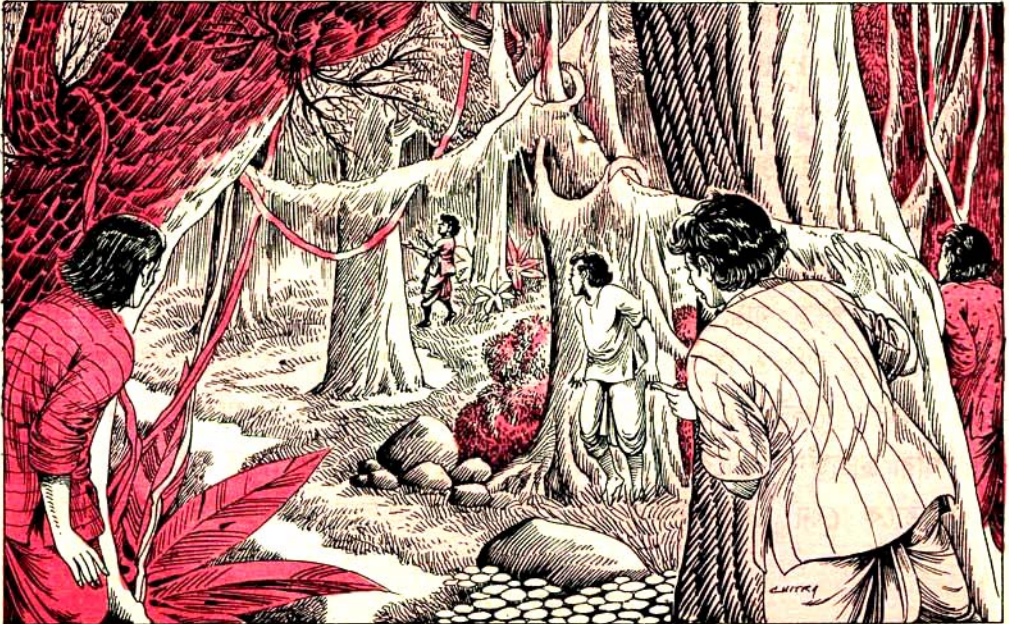
অন্ধকার হওয়ার আগেই রামানন্দ ঘরে ফিরে এল। তাকে একটা থামে বেঁধে পণ্ডিত তাকে জিজ্ঞেস করল, "তোমার রহস্য আমি জানতে পেরেছি। তুমি মন্ত্র জান। আর তোমার কাছে কি একটা ওষুধ আছে। তুমি এই দুটোর জোরে আমি যা শেখাই তার চেয়ে অনেক বেশি শিখে নিতে পার। তুমি ঐ মন্ত্র আমাকে শিখিয়ে দাও, ওষুধ আমাকে দাও, তাহলে আমি ছাত্রদের অনেক বেশি বিদ্যা দান করতে পারব।"

পণ্ডিতের কথা শুনে রামানন্দ অবাক হয়ে গেল। তাকে জানাল যে তার কাছে কোন ওষুধ নেই, মন্ত্রও সে জানে না।

পণ্ডিত রেগে গিয়ে বলল, "মিথ্যে কথা বলার জায়গা পাওনি! আমি জানি না ভেবেছ? তুমি সারা দুপুর গাছের কাছে ঘোরাঘুরি করে মন্ত্র পড় না? দুপুরে পুকুরের ধারে বসে লেখাপড়ার বড়ি খাও না? ওসব বড়ি না দিলে আমি তোমার মাথা নেব।"

রামানন্দ মনে মনে ভাবল যে সে তাকে যতটা মূর্খ ভাবত সে তার চেয়েও বড় মূর্খ। কি যেন কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে পণ্ডিতকে বলল, "পণ্ডিত মশাই, আপনি আমার সমস্ত গোপন ব্যাপার জেনে নিলেন। আপনার কাছে আর কিছু গোপন রাখা যাবে না। হ্যাঁ, সত্যি আমি মন্ত্র
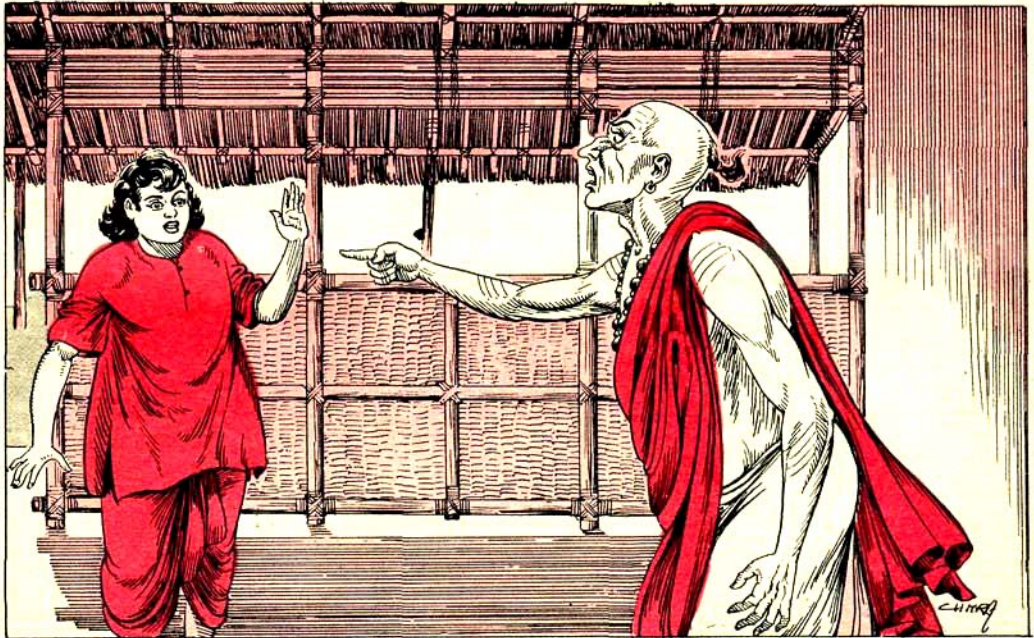
জানি। কিন্তু ঐ মন্ত্র অন্য কাউকে শেখালেই আমি মারা যাব। তবে ঐ মন্ত্র পড়ে লেখাপড়ার বড়ি তৈরি করে আমি অন্য কাউকে দিতে পারি। আমার কাছে যতগুলো বড়ি ছিল সব শেষ হয়ে গেছে। আমাকে তৈরি করতে হবে।"

"তাহলে বড়ি তাড়াতাড়ি তৈরি কর।" পণ্ডিত বলল।

"বড়িগুলো বানাতে খুব কম করে এক সপ্তা সময় লাগে। চার ভরি সোনা কম করে তিন দিন টানা আগুনে পোড়াতে হয়। তার সঙ্গে আমি যে বই পড়তে চাই সেই বইগুলোও আগুনে পোড়াতে হয়। তারপর ঐ সোনা আর বইয়ের ছাই দিয়ে মন্ত্র পড়তে পড়তে বড়ি বানাতে হয়। সেই বড়ি খেলেই ঐ বইগুলোতে যা ছিল তা মাথায় ঢুকে যায়। ঐ বইয়ের সারমর্ম আজীবন মাথায় থাকে।" রামানন্দ বুঝিয়ে বুঝিয়ে বলল।

"চার ভরি সোনা আর এমন কি। আমি দিচ্ছি। আর বই? ওতো তাকে অনেক আছে। যত চাও, নিতে পার। যত বেশি বড়ি করতে পার কর।" পণ্ডিত বলল।

রামানন্দ তাক থেকে সমস্ত বই নাবিয়ে আর চার ভরি সোনা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। তার সঙ্গে পণ্ডিত ও অন্য ছাত্ররাও গেল। আগুন ধরানো হল। আগুনের এক কোণে চার ভরি সোনা রাখা হল। তিন দিন তিন রাত্রি মন্ত্র পড়তে রামানন্দ বসে গেল। পণ্ডিত ও অন্যান্য ছাত্ররা হাঁ করে দেখতে লাগল। রাত হল। ওরা রামানন্দকে কোন কথা না বলে চুপি চুপি ফিরে গেল। রামানন্দ ওদের চলে যাওয়া পর্যন্ত কি যেন বিড় বিড় করে পড়তে লাগল। তারপর ওদের যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রামানন্দ আসন থেকে উঠে আগুন নিভিয়ে সোনা তুলে বই নিয়ে কাশীর পথে রওনা দিল উচ্চ শিক্ষা লাভের আশায়।

শিক্ষকের কুশিক্ষা

কোন এক গ্রামে এক জমিদার ছিল। তার ছিল মাত্র একটি ছেলে। জমিদার তার ছেলেকে লেখাপড়া করতে পাঠালো সিদ্ধাচার্যের কাছে। সিদ্ধাচার্য ঐ গ্রামের নামকরা শিক্ষক। ছেলের বয়স বার বছর হতেই তার লেখাপড়া শেখা শেষ হল। জমিদার অনেক উপহার দিয়ে গুরু বিদেয় করল।

সিদ্ধাচার্য অত্যন্ত লোভী ছিল। সে জমিদারের ছেলেকে গোপনে ডেকে বলল, "তোমার বাবা আমাকে যা দেবার তা দিয়েছেন। কিন্তু তুমি তোমার নিজের যা আছে তা যতক্ষণ না দিচ্ছ ততক্ষণ তোমার শিক্ষালাভ পূর্ণ হবে না। আমার এই কথা কারো কাছে প্রকাশ করা তোমার উচিত নয়।"

"আমার জন্মদিনে যা পেয়েছি তা আছে। আর সামান্য কিছু আত্মীয়স্বজনদের কাছে যা পেয়েছি তাও জমিয়ে রেখেছি।"

"তুমি ঐ টাকা পয়সা নিয়ে মধ্যরাত্রে কালী মন্দিরে আসবে। তোমার অপেক্ষায় থাকব।" সিদ্ধাচার্য বলল।

সে রাজী হল গুরুর কথা মত কাজ করতে। কাছেই ছিল কালী মন্দির। মধ্যরাত্রে সিদ্ধাচার্য অপেক্ষায় বসে রইল।

তার আগেই একটা লোক সেই মন্দিরে এসে কাপড় মুড়ি দিয়ে এক কোণে শুয়ে ছিল। সিদ্ধাচার্য তাকে দেখতে পেল না। গা ঢাকা দিয়ে শুয়ে থাকা ঐ লোকটা ছিল পাশের গ্রামের এক কিষাণ। সেই দিন সকালেই সে আম বিক্রি করতে এসে ছিল ঐ জমিদারের গ্রামে। গ্রামে ঢুকতেই

লোকনাথ চট্টোপাধ্যায়

এক জ্যোতিষী ঐ কিষাণের হাত দেখে বলল, "কোন ব্যাপারে সাহসের পরিচয় দিলে তুমি লাভবান হবে।"

কিষাণ জ্যোতিষীর হাতে একটা সিকি দিয়ে গান গাইতে গাইতে চলে গেল।

সকালে শাল মুড়ি দিয়ে বেড়ানো জমিদারের বরাবরের অভ্যেস। সে দূর থেকে জ্যোতিষী ও কিষাণকে দেখল। কিষাণকে জমিদার জিজ্ঞেস করল, "কি ব্যাপার বলত, তোমাকে খুব খুশী খুশী দেখাচ্ছে?"

"জ্যোতিষী আজ আমাকে খুব ভাল একটা কথা বলেছেন। সাহসী হলে আমার নাকি খুব লাভ হবে। সাহসী হলে কি হবে না হবে তা ভগবানই জানেন, আমার এই আমগুলো তাড়াতাড়ি বেশী দামে বিক্রি হয়ে গেলেই আমি খুশী।" কিষাণ জমিদারকে চিনতে পারেনি। কারণ জমি-দারের আপাদমস্তক চাদরে মোড়া ছিল।

জমিদারের কৌতুহল জাগল জ্যোতিষীর কথা কতখানি ফলে তা জানার। কিষাণ এগিয়ে গেল। জমিদার পিছনে সরে গিয়ে তার চাকরকে কি যেন বলল। তৎক্ষণাৎ চাকর ঐ কিষাণের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "তোমার সাহস তো কম নয়! অন্য গ্রাম থেকে এই গ্রামে আম বিক্রি করতে এসেছ আর জমিদারকে ভেট দিলে না!" বলেই চাকরটা আমের ঝুড়ি নিয়ে চলে গেল।

ফল বিক্রেতা কিষাণের ভীষণ দুঃখ হল। বিক্রি করে লাভ করা দূরে থাক সমস্ত ফলগুলো নিয়ে লোকটা পালাল। অন্য গ্রামে এসে সেই গ্রামের লোকের সঙ্গে পেরে ওঠা শক্ত ভেবে মাথা নীচু করে হাঁটতে লাগল। মনে মনে ভাবল জ্যোতিষীর কথার কোন মানে হয় না। অন্য গ্রামে এসে অত সাহস দেখানো যায়! পাগলের মত সে সারা গ্রামে ঘুরতে লাগল। জ্যোতিষীর খোঁজ করল ঘুরতে ঘুরতে। কিন্তু তাকে খুঁজে পেল না। শেষে সে ঐ কালী মন্দিরের এক কোণে ঘুমিয়ে পড়ল।

সবার ঘুমানোর পর জমিদারের ছেলে টাকা পয়সা নিয়ে ঐ কালী মন্দিরে এল। সিদ্ধাচার্য ছেলেটিকে দেখেই বলল, "বাবা এসেছ ? কত টাকা এনেছ বাবা ?"

"একশো টাকা।" ছেলেটা বলল।

"বা, ভাল। টাকাটা আমার হাতে দিয়ে তুমি ফিরে যাও।" সিদ্ধাচার্য বলল।

ওদের কথা কানে যেতেই কিষাণের ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে কোন সাড়া শব্দ না করে ঘাপটি মেরে শুয়ে ছিল। কান খাড়া করে ওদের কথা শুনছিল। সিদ্ধা-চার্যের হাতে টাকার পোঁটলা দেখে গম্ভীর গলায় সে বলল, "টাকা নিয়ে কোথায় যাচ্ছিস ? রেখে যা এখানে !" শুনে সিদ্ধাচার্য পোঁটলা ফেলে রেখে চলে গেল।

কিষাণ তুলে নিল ঐ টাকার পোঁটলা। ভাবল জ্যোতিষীর কথাই ঠিক। সাহসের সঙ্গে গর্জে উঠেছি বলেই টাকা পেয়েছি। কিষাণের খুব আনন্দ হল। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবল এত টাকা নিয়ে গ্রামে যাবে কি করে ! ঠিক করল ঐ টাকা জমিদারকে দিয়ে নিজের ফল ফেরত চাইবে। ওদিকে জমিদারের চাকর সারাদিন ধরে জ্যোতিষী ও কিষাণের উপর নজর রেখেছিল। মাঝরাত্রে চাকর এসে জমিদারকে খবর দিল যে তার ছেলে টাকা নিয়ে গিয়ে সিদ্ধাচার্যকে দিয়েছে।

জমিদারের বাড়িতে কিষাণের আসার পর কিছুক্ষণের মধ্যে চাকর ধরে আনল জ্যোতিষী ও সিদ্ধাচার্যকে। জমিদার সিদ্ধাচার্যকে বলল, "আমি আপনাকে যে পুরস্কার দিয়েছি তা কম হয়ে থাকলে আপনি আমাকে বলতে পারতেন। আমি আরও দিতাম। ছোট ছেলেকে দিয়ে এসব কাজ করাতে আছে ?" জমিদার সিদ্ধাচার্যকে বকল, কিষাণকে আমের টাকা ও পুরস্কার দিল। এবং জ্যোতিষীকেও কিছু টাকা উপহার দিল। কিষাণ ও জ্যোতিষী আনন্দে ফিরে গেল। সিদ্ধাচার্যের মুখ চুন হয়ে গেল।

চুরি-বিদ্যা

কয়েকশো বছর আগের কথা। বিদিশা নগরের প্রজারা ধর্মপথে চলত। শাসন কাজও এমন ভাবে চলত যাতে প্রজাদের কোন ক্ষতি না হয়। কোন রকম চুরি হত না।

প্রতিবেশী দেশ থেকে একবার মধুগুপ্ত নামে এক ব্যক্তি নিজের সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে বিদিশা নগরে আসে।

নিজের একটা বাড়ি তৈরি করিয়ে তরি-তরকারির ব্যবসা করতে লাগল। এইভাবে এক বছর কেটে গেল। তারপর মধুগুপ্ত বাড়িতে এক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করল। নিজের সমস্ত খদ্দেরকে নিমন্ত্রণ করে সবাইকে খাওয়াল।

খাওয়া দাওয়া সেরে খদ্দেররা কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে যে যার প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে নিয়ে গেল। ওদের মধ্যে একজন এক সের চালের দাম দিয়ে গোপনে আর এক সের চাল নিয়ে হাঁটা দিল।

অন্যজন এক সের ছোলার দাম দিয়ে দুসের ছোলা নিয়ে চম্পট দিল। আর একজন অতিথি সবার চোখে ধুলো দিয়ে খিড়কির দরজায় বাঁধা একটা গরু নিয়ে পালাল।

এইভাবে যে যা পেল হাতের কাছে তা নিয়ে সরে পড়ল।

এসব কিছুই মধুগুপ্তের নজরে পড়েনি। তার বউ হঠাৎ এক সময়ে জিজ্ঞেস করল, "হ্যাঁগো, আমাদের সোনার থালাটা কোথায়? পাচ্ছি না।"

কিছুক্ষণ পরে তারা টের পেল খিড়কির দরজায় বাঁধা গরুও নেই।

নিরাপদ ভট্টাচার্য

মধুগুপ্ত ঠিক করল এই দুটো জিনিসের চুরির ব্যাপারে সকালে রাজার কাছে গিয়ে অভিযোগ করে আসবে।

কিন্তু পরের দিন সকালে যা ঘটল তাতে মধুগুপ্ত অবাক হয়ে গেল। যে যা চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল সে তা তার বাড়িতে এসে ফেরত দিয়ে গেল। ফেরত দিয়ে গেল গরুও। এবং প্রত্যেকে ক্ষমা চাইল।

ওদের প্রতি মধুগুপ্তের বিরক্তি জাগল। ঘৃণাও পোষণ করল ওদের প্রতি। সে যা কল্পনা করেনি তাই ঘটল।

তাছাড়া অন্য এক কারণ হল সব পেলেও এখনও সোনার থালাটা পায়নি।

"তোমরা তো অদ্ভুত ধরণের চোর। তোমরা অতিথি হয়ে চুরি করেছ। তোমাদের ক্ষমা করব কি! সস্তা জিনিষগুলো ফেরত দিলে আর পাঁচ হাজার টাকার সোনার থালার পাত্তা নেই। যতক্ষণ না তোমরা আমার সোনার থালা ফেরত দিচ্ছ ততক্ষণ আমি তোমাদের যেতে দেব না।" মধুগুপ্ত ধমক দিয়ে বলল।

তার কথা শুনে সবাই জানাল যে তারা ওরকম কোন সোনার থালার ব্যাপারে কিছুই জানে না।

"তাহলে চল রাজদরবারে।" তারপর মধুগুপ্ত সবাইকে রাজদরবারে নিয়ে গেল।
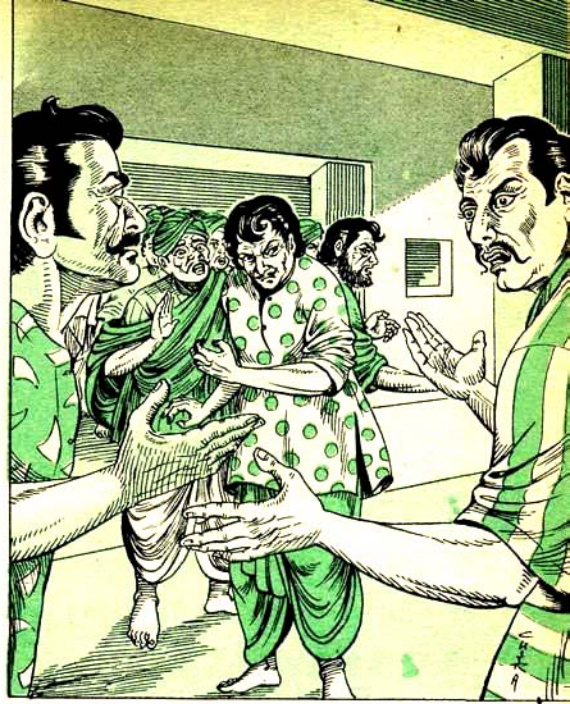
ইতিমধ্যে আরও একটি চোর ধরা পড়ল। সোনার থালা নিয়েছিল মধুগুপ্তেরই বাড়ির চাকর রঘু।

যেদিন থেকে মধুগুপ্তের বাড়িতে সে কাজে লেগেছে সেদিন থেকেই প্রত্যেকদিন সুযোগ বুঝেই কোন না কোন জিনিস সে চুরি করত।

রঘুই তার আগের দিন অতজন অতিথির ভিড়ে সোনার থালাটাই নিয়ে গেল।

পরের দিন সকালে রঘু ঐ সোনার থালা বিক্রি করতে কাছের একটা স্বর্ণকারের কাছে গেল।

সেই সময় পাশের দেশের একজন ঐ স্বর্ণকারের সঙ্গে কথা বলছিল। সে ঐ

থালাটা দেখেই চিনতে পেরে বলল, "এটাতো আমার থালা। বহুদিন আগে আমার একটা বাক্স চুরি হয়েছিল। ঐ বাক্সে এই থালাটা ছিল। এই লোকটাকে জিজ্ঞেস করুন তো কোত্থেকে ও এই থালা পেয়েছে।"

সেই মুহূর্তে স্বর্ণকার রঘুকে নিয়ে রাজার কাছে গেল। রাজাকে রঘু জানাল যে সে ঐ সোনার থালা মধুগুপ্তের বাড়ি থেকে চুরি করেছে।

মধুগুপ্তকে রাজদরবারে ডেকে পাঠিয়ে রাজা নিজের কর্মচারিদের দিয়ে তার বাড়ি তল্লাস করালেন।

অন্য দেশ থেকে যে লোকটা এসেছিল তার বাক্সটা মধুগুপ্তের বাড়িতেই গোপন জায়গায় রাখা ছিল।

আসল ব্যাপার হল সবার মধ্যে চুরি করার ঝোঁক যে জেগেছিল তার জন্য দায়ী হল ঐ মধুগুপ্ত।

মধুগুপ্ত নিজের দেশে চুরি করেই জীবন যাপন করত। পরে আগন্তুকের বাড়ি থেকে ঐ বাক্সটি চুরি করে ধরা পরার ভয়ে বাক্সটি নিয়ে সে বিদেশে চলে আসে।

বিদিশা নগরে এসে ব্যবসা করলেও তার আচার আচরণে চৌর্য বৃত্তির লক্ষণ পরিস্কার ভাবে ফুটে উঠেছিল। খদ্দেরদের নিমন্ত্রণ করে তাদের মনেও চুরির ঝোঁক ঢুকিয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু পরের দিনই ওরা অনুতপ্ত হয়ে ফেরত দিয়ে গেল। অনেকদিন মধুগুপ্তের বাড়িতে থাকার ফলে রঘু পাকা চোর হয়ে গেল।

রাজা দুঃখ প্রকাশ করে আগন্তুককে সোনার থালা ও অন্যান্য জিনিসপত্র সহ বাক্স ফেরত দেওয়ালেন।

মধুগুপ্ত এবং রঘুকে চুরির অপরাধে অভিযুক্ত করে কঠোর শাস্তি দিলেন।

মহাভারত

পাণ্ডবদের সেনাবাহিনী কুরুক্ষেত্রে পৌঁছে শিবির তৈরির উপযুক্ত পরিবেশ ও জায়গা খুঁজে নিল। সেখানে ঘাস আছে। জলের ব্যবস্থাও সুরক্ষিত। কাঠেরও অভাব নেই। কাছে মন্দির, ঋষিদের কোন আশ্রম অথবা শ্মশান নেই। কৃষ্ণ ও অর্জুন অন্য রাজাদের সঙ্গে নিয়ে শিবির তৈরির অঞ্চল বার বার ঘুরে ঘুরে দেখছিল।

ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি প্রমুখ শিবির তৈরির মূল দায়িত্বে ছিল। হিরণবতী নদীতীরে পাণ্ডবদের শিবির গঠিত হল। কৃষ্ণ শিবিরগুলোর চারদিকে খুব চওড়া খাল খনন করাল। পাণ্ডবদের শিবির যে পরিকল্পনায় তৈরি করা হল অন্যদের শিবিরও একই ভাবে গঠিত হল।

শুধু যে সেনাবাহিনী এসেছে তাই নয়, তাদের সঙ্গে এসেছে হাজার হাজার শিল্পী ও বৈদ্য। সমস্ত রকমের অস্ত্র ও খাদ্য সযত্নে সুরক্ষিত হল। যুধিষ্ঠির ঘুরে ঘুরে প্রত্যেকটি শিবির দেখছিলেন।

খুব দুঃখিত হয়ে যুধিষ্ঠির গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়লেন। তিনি বলতে লাগলেন, "যে অশান্তি রোধ করবার জন্য বনবাসের দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছিলাম, সেই অশান্তি আর অঘটনই ঘটতে চলেছে। গুরুজনদের হত্যা করে শান্তিলাভ করব কেমন করে? আর কি ভাবেই বা জয়লাভ করব।"
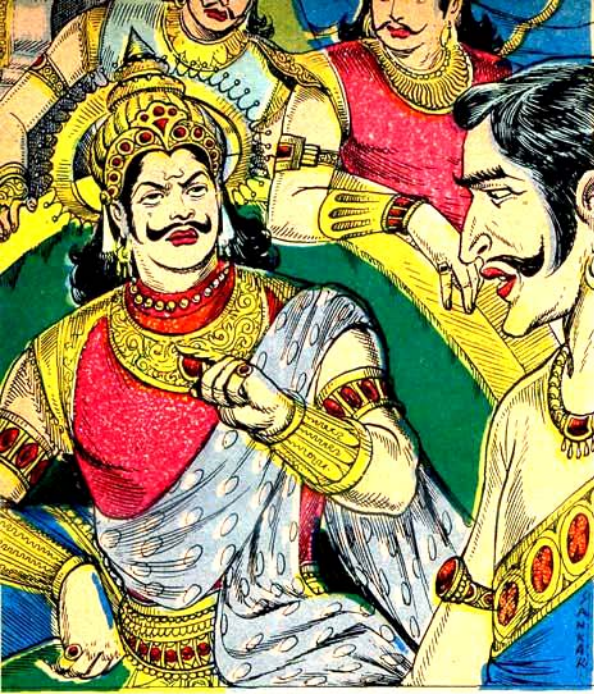
অর্জুন বললেন, "মহারাজ! কুন্তী, কৃষ্ণ ও বিদুর কখনও অন্যায় বা অধর্ম কাজ করতে বলবেন না। এভাবে যুদ্ধ না করে ফিরে যাওয়া আপনার কর্তব্য নয়।"

কৃষ্ণ হেসে বললেন, "সত্যি কথা।"

দ্রুপদ, বিরাট, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ধৃষ্টকেতু, শিখণ্ডী ও মগধরাজ আর সহদেব এই সাতজনকে সেনাপতির পদে নিযুক্ত করলেন। তাছাড়া তিনি ধৃষ্টদ্যুম্নকে সর্ব-সেনাপতি, অর্জুনকে সেনাপতিপতি এবং কৃষ্ণকে অর্জুনের নিয়ন্তা ও অশ্বচালকের পদে নিযুক্ত করলেন।

কুরুপাণ্ডবের ঘোর অমঙ্গলজনক যুদ্ধের প্রস্তুতির খবর পেয়ে অক্রুর, উদ্ধব, শাম্ব, প্রত্যুম্ন, হলায়ুধ ও বলরাম যুধিষ্ঠিরের গৃহে এলেন। কুশলাদি জিজ্ঞাসাবাদের পর সকলে আসন গ্রহণ করলেন।

তারপর বলরাম কৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে বললেন, "দৈবের বিড়ম্বনায় এই দারুণ ক্ষতিকর যুদ্ধ হতে চলেছে। এ যুদ্ধ রোধ করার আর উপায় নেই। তবে আমি প্রার্থনা করি যে আপনারা সকলে শারীরিক কুশলে থাকবেন এবং অক্ষত শরীরে যুদ্ধে জয়লাভ করবেন।" তারপর যুধিষ্ঠিরকে বললেন, "মহারাজ, কৃষ্ণকে আমি অনেক করে বলেছি যে আমাদের কাছে পাণ্ডবরা যেমন দুর্যোধনও তেমনি। কাজেই দুর্যোধনকেও সাহায্য করা তোমার কর্তব্য। কিন্তু তাতে কৃষ্ণ রাজী নয়। অর্জুনের প্রতি তার ভালবাসা অত্যন্ত বেশী। তাই আপনার পক্ষেই কৃষ্ণ সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছেন। তাই আপনারা যুদ্ধে অবশ্যই জয়লাভ করবেন। আমিও কৃষ্ণকে ছাড়া অন্য দলে যোগ দিতে পারি না। তাই কৃষ্ণের ইচ্ছাই আমি পূর্ণ করব।

কৃষ্ণ হস্তিনাপুর থেকে চলে যাওয়ার পর দুর্যোধন কর্ণ ও অন্যান্যদের বললেন, "কৃষ্ণ কৃতকার্য হতে পারেন নি। তিনি যে এজন্য খুবই রেগে গেছেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পাণ্ডবদেরও উত্তেজিত করবেন যুদ্ধ করবার জন্য। তিনি যুদ্ধ

ঘটাতেই চান। ভীম, অর্জুন ও অন্যান্য সকলেই তাঁর ইচ্ছে মতই চলবেন। কাজেই এ দারুণ যুদ্ধ অবশ্যই ঘটবে। হাজার হাজার শিবির তৈরি কর। শিবিরে যাতে জল, কাঠ, অস্ত্র এবং পতাকা থাকে সে ব্যবস্থা কর। খাবার আনার পথ যেন শত্রুরা বন্ধ করতে না পারে।"

দুর্যোধনের নির্দেশ মত কুরুক্ষেত্রে সেনানিবাস তৈরি হল। সমাগত রাজারা যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হলেন। রথী, অশ্বারোহী, গজারোহী ও পদাতিক সৈন্যগণ যুদ্ধের জন্য নানা ভাবে সজ্জিত হল।

দুর্যোধন হাত জোড় করে ভীষ্মকে বললেন, "পিতামহ, সেনাপতি না থাকলে বিশাল সৈন্যদলও পিপীলিকার মতই মৃত্যু বরণ করে। আপনি শুক্রাচার্য তুল্য যুদ্ধ নিপুণ। তাছাড়া আপনি ধার্মিক এবং আমার মঙ্গলাকাঙ্খী। অতএব, আপনিই আমাদের সেনাপতি হবেন। গো-বাছুর যেমন তার মাকে অনুসরণ করে, আমরাও তেমনি আপনাকেই অনুসরণ করব।"

"ভীষ্ম বললেন, "দেখ দুর্যোধন, আমার কাছে তোমরা যেমন পাণ্ডবরাও তেমনি। তবুও আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কাজেই তোমার পক্ষে তোমার জন্যই যুদ্ধ করব আমি। আমার সমতুল্য যোদ্ধা একমাত্র অর্জুন। পাণ্ডবদের ধ্বংস করা আমার কর্তব্য নয়। তবে যতদিন আমি তাঁদের হাতে মৃত্যু বরণ না করব, ততদিন আমি প্রতিদিন পাণ্ডব-পক্ষের দশ হাজার সৈন্য ধ্বংস করতে পারি। কিন্তু কর্ণ সব সময় আমার সাথে তাঁর ক্ষমতার তুলনা করেন, এ অবস্থায় তিনিই সেনাপতি হবেন।"

তখন কর্ণ বললেন, "যতদিন ভীষ্ম জীবিত থাকবেন, ততদিন আমি অর্জুনের সাথে যুদ্ধ করব না। তাঁর মৃত্যুব পরই আমি অর্জুনের সাথে যুদ্ধ করব।"

এরপর প্রচুর সামগ্রী ও নানা রকম উপহার আর বিপুল আয়োজনের মধ্যে দিয়ে ভীষ্ম সেনাপতির পদে অভিষিক্ত হলেন। হাজার শঙ্খ ধ্বনিত হল। কিন্তু

এই মাঙ্গলিক আয়োজনে নানা রকম অশুভ লক্ষণও দেখা যাচ্ছিল।

কুরুক্ষেত্রে হিরণবতী নদীর কাছে পাণ্ডবগণ তাঁদের সৈন্য একত্র করে সাজালেন। আর কৌরবরাও তাঁদের সেনা স্থাপন করালেন সেখানে। দুর্যোধন, কর্ণ ও দুঃশাসন, শকুনির সাথে পরামর্শ করে ঠিক করলেন শকুনির পুত্র উলূকই দূত হয়ে যাবেন পাণ্ডবদের কাছে। সেভাবেই তিনি উলূককে বললেন, "তুমি নারদের উপাখ্যানটি যুধিষ্ঠিরকে শুনিয়ে দিও। এক শয়তান বিড়াল ঊর্দ্ধবাহু হয়ে গঙ্গার তীরে ধ্যান মগ্ন থাকার অভিনয় করত। তখন সব পাখিরা তার কাছে গিয়ে বিড়ালের খুব প্রশংসা করছিল। আর বিড়াল তা দেখে ভাবল যে তার ব্রত সার্থক হয়েছে। কিন্তু বহুদিন পরে একদল ইঁদুর ঠিক করল ইনি আমাদের মাতুল। আমাদের সকলকে ইনিই রক্ষা করবেন। ইঁদুরদের এই প্রার্থনা শুনে বিড়াল বলল, শোন তোমরা সকলে, তপস্যা এবং রক্ষা দুটো কাজ এক সাথে করা সম্ভব নয়। তবুও আমি চেষ্টা করব তোমাদের রক্ষা করতে। যাতে তোমাদের মঙ্গল হয় তার চেষ্টা করব। কিন্তু আমি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, কঠোর ব্রত করছি, কোথাও একলা যাবার মত সামর্থ আমার নেই। বাছারা, আমাকে তোমরা প্রতিদিন নদীর তীরে বয়ে নিয়ে যাবে। তাতেই ইঁদুররা রাজী হল। সমস্ত ইঁদুররা বিড়ালের আশ্রয়ে এল।

এই ভাবে সেই বিড়াল ইঁদুর খেয়ে খেয়ে দিন দিন শক্তিশালী ও মোটা সোটা হতে লাগল। তাই দেখে ইঁদুররা ভাবল, তাদের মাতুল প্রতিদিনই বড় হচ্ছে আর বলশালী হচ্ছে। কিন্তু তাদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে কেন? তখন ডিণ্ডিক নামে একটি ইঁদুর বিড়ালকে পরীক্ষা করার জন্য তার সাথে গেল। বিড়াল তাকে যথারীতি খেয়ে ফেলল। তারপর কোলিক নামে এক বুড়ো ইঁদুর বলল, এঁর সাধনা ছলনা মাত্র, এঁর
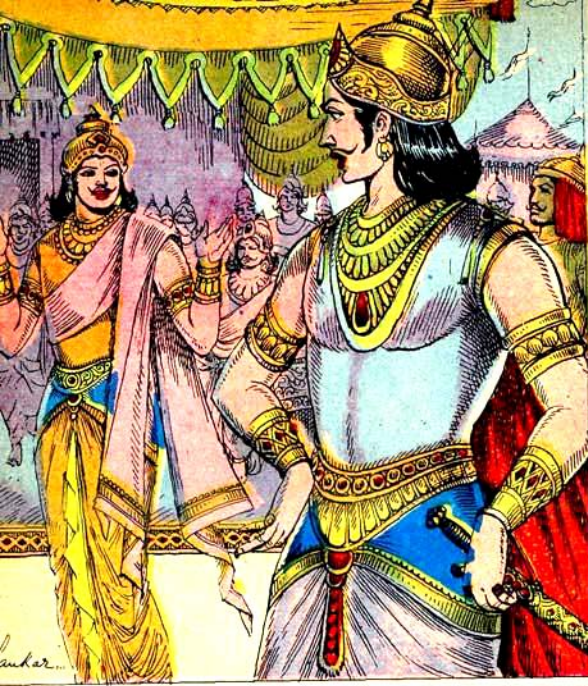
বিষ্ঠায় লোম দেখা যায়। কিন্তু যে ফল মূল আহার করে তার বিষ্ঠায় লোম থাকে না। তাছাড়া আমাদের দলের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। ডিণ্ডিককেও আজ কতদিন দেখতে পাচ্ছি না। তার কথা শুনে সব ইঁদুর পালিয়ে গেল। আর বিড়াল তার আগের জায়গায় ফিরে গেল। দুষ্টমতি যুধিষ্ঠির তুমিও বৈড়াল ব্রত নিয়ে আত্মীয়দের প্রতারণা করছ।"

তারপর আবার বললেন, "যুধিষ্ঠিরকে বলার পর তুমি কৃষ্ণকে বলবে, কৌরব সভায় তুমি যে মোহিনী মায়া সৃষ্টি করে ছিলে সেই মায়ারূপ ধারণ করে আমাকে তাড়া করুক। ইন্দ্রজাল মায়া কুহক বা বিভীষিকা দেখলে কোন অস্ত্রধারী বীর ভয় পায় না বরং সিংহের মত গর্জে ওঠে। নানা প্রকার মায়ারূপ আমরা দেখাতে পারি। কিন্তু দুর্বলের মত সেভাবে সফল হওয়ার ইচ্ছেও আমাদের নেই। তুমি হঠাৎ খ্যাতি-মান হয়েছ কিন্তু আমাদের অজানা কিছু নয় যে পুরুষ চিহ্নরূপী নপুংসক বহু লোক আছে। কংসরাজের ভৃত্য ছিলে তুমি। তাই আমার সমতুল্য কোন রাজাই তোমার সাথে যুদ্ধ করেন নি। আর বহুভোজী ভীমকে বলবে, তুমি বল্লব নামে বিরাট রাজের প্রাসাদে পাচক হয়ে ছিলে। কিন্তু তা এক-মাত্র আমার জন্য, আমারই পৌরুষের জন্য। দ্যূতসভায় যে প্রতিজ্ঞা তুমি করেছিলে তা যেন সত্যি হয়। যদি তোমার সে শক্তি বা সাহস থাকে তবে দুঃশাসনের রক্ত পান করো। তাছাড়া নকুল আর সহদেবকে বলবে, কৌরবসভায় দ্রৌপদী যে লাঞ্ছনা ও অপ-মানিত হয়েছে তাই মনে করে যেন তাদের পৌরুষের ক্ষমতা দেখায়।" বিরাট আর দ্রুপদ রাজাকেও বলবে, প্রভু আর ভৃত্য তাদের গুণাগুণ যাচাই করে না। তাই গৌরবহীন যুধিষ্ঠির আপনাদের প্রভু হয়েছে। ধৃষ্টদ্যুম্নকে বলবে, সে যেন দ্রোণের সাথে পাপযুদ্ধ করতে আসে।

শিখণ্ডীকে বলবে, তুমি নিশ্চিন্ত মনে যুদ্ধ করতে আসতে পার। ভয় নেই।

ভীষ্ম তোমাকে স্ত্রীলোক বলেই জানেন। তিনি তোমাকে মারবেন না।"

উলূক, "অর্জুনকে তুমি বলবে রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে বনবাসের কষ্ট আর দ্রৌপদীর অপমান মনে করে যেন তার পৌরুষের ক্ষমতা দেখাতে পারে। ঘোড়াগুলো খাবার খেয়ে আরও বলশালী হয়েছে। যোদ্ধারাও তাদের প্রাপ্য বেতন পেয়ে গেছে। কোন অসুবিধা নেই। আগামী কালই তুমি কৃষ্ণকে সাথে করে এসে যুদ্ধ করতে পার। মূর্খ তুমি, তাই বিরাট বিশাল এই কৌরব সেনাদের ক্ষমতা কতখানি তা বুঝতে পারনি। কৃষ্ণ তোমার পক্ষে, তোমাকে সাহায্য করবেন জানি। তোমার গাণ্ডীব চার হাত লম্বা তাও অজানা নয় আমাদের। তোমার সমান যোদ্ধা এ জগতে নেই তাও অজানা নয়। তবুও বলছি শোন, তোমাদের রাজ্য ছাড়া করে তের বছর তোমাদের রাজ্য ভোগ করেছি। দ্যূতসভায় কোথায় ছিল তোমার গাণ্ডীব? কোথায় ছিল ভীমের ক্ষমতা আর তার বল বিক্রম? আমাদের দাস হয়েছিলে তোমরা। দ্রৌপদীই তোমাদের উদ্ধার করেন। নপুংসক সেজে দীর্ঘ বেণী দুলিয়ে তুমি বিরাটরাজের কন্যাকে নাচ শিখিয়েছ। আর এখন কৃষ্ণকে সঙ্গে এনে যুদ্ধ করছ। তোমাদের আমি এক
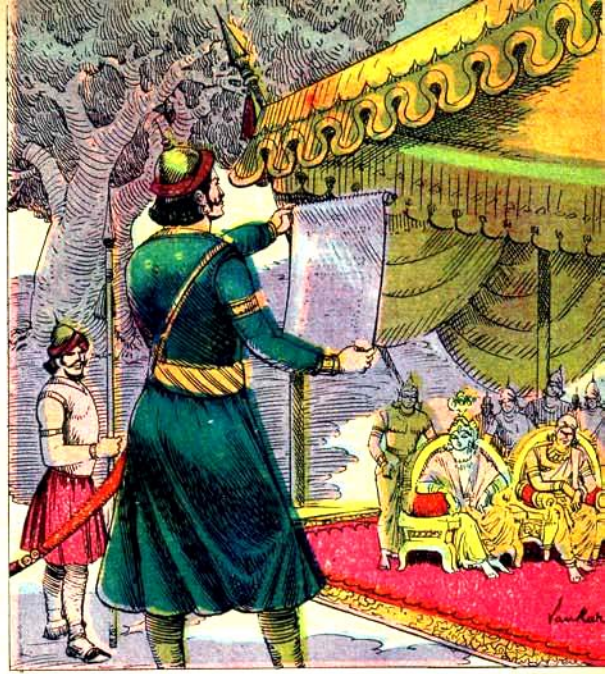
বিন্দুও ভয় করি না। হাজার হাজার কৃষ্ণ, শত শত অর্জুনও আমার অব্যর্থ বাণের আঘাতে জর্জরিত হবে।" সব বুঝিয়ে উলূককে বিদায় দিলেন।

পাণ্ডবদের শিবিরে গিয়ে উলূক দুর্যোধনের সমস্ত কথা যথাযথ ভাবে তাঁদের জানালেন। শুনে ভীম রেগে উঠলেন ভীষণ ভাবে। তাই দেখে কৃষ্ণ মৃদু হেসে উলূককে বললেন, "শকুনিপুত্র তুমি তাড়াতাড়ি ফিরে যাও। দুর্যোধনকে বলো তাঁর সব কথা আমি শুনেছি। কি তার অর্থ তাও বুঝতে বাকি নেই। তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হবে।"

ভীম বললেন, "মূর্খ দুর্যোধনকে বলো তুমি, যে দুঃশাসনের রক্ত পান করে আমি

আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করব। আর উলূক তোমার পিতার সামনেই তোমাকে বধ করব। তারপর ঐ পাপিষ্ঠকে বধ করব।"

অর্জুন হেসে বললেন, "ভীমসেন আপনার সাথে যাদের শত্রুতা তারা কেউ এখানে নেই। এভাবে উলূককে কঠোর বাক্য বলা ঠিক হচ্ছে না।" উলূক, অহংকারী দুর্যোধন যে কথা বলেছেন, গাণ্ডীব দ্বারা সৈন্যদের সামনে তার জবাব দেব।

যুধিষ্ঠির বললেন, "বৎস শকুনিপুত্র, তুমি দুর্যোধনকে বলবে, পরের রাজ্য বা পরের জিনিস যে লোক হরণ করে এবং নিজের ক্ষমতা বলে তা রাখতে না পেরে অন্যের সাহায্য প্রার্থনা করে, সে নপুংসক। দুর্যোধন, তুমি অন্যের শক্তিতে নিজেকে শক্তিমান ভেবে দাপট দেখাচ্ছ কেন?"

অর্জুন বললেন, "উলূক, তুমি দুর্যোধনকে বলবে, তুমি মহাজ্ঞানী ভীষ্মকে যুদ্ধে নামিয়েছ। ভেবেছ আমরা তাকে মারব না, দয়া করবো। আমাদের দুর্বলতা থাকবে তাঁর প্রতি। যাঁর ওপর তুমি এত নির্ভর করছ, তাঁকেই আমি প্রথমে এবং প্রথম আঘাতে বধ করব।"

বিরাটরাজ ও দ্রুপদ বললেন, "আমরা সাধু ব্যক্তির দাসত্ব প্রার্থনা করি। আমরা যাই হই না কেন, আর কার পৌরুষের জোর কত সবই দেখতে পাব আগামী কাল।"

শিখণ্ডী বললেন, "ভীষ্মবধের জন্যই বিধাতা আমাকে সৃষ্টি করেছেন। রথ থেকে আমিই তাঁকে ভূপাতিত করব।"

ধৃষ্টদ্যুম্ন বললেন, "দ্রোণকে সসৈন্যে ও সবান্ধবে আমিই বিনষ্ট করব। এ কাজ আমি একাই করব আর কারো দ্বারা এ কাজ সম্ভব নয়।"

পাণ্ডবদের কাছে সব কথা শুনে উলূক কৌরব শিবিরে পৌঁছে সব কথা তাঁদের জানালেন।

শিবলীলা

[ছয়]
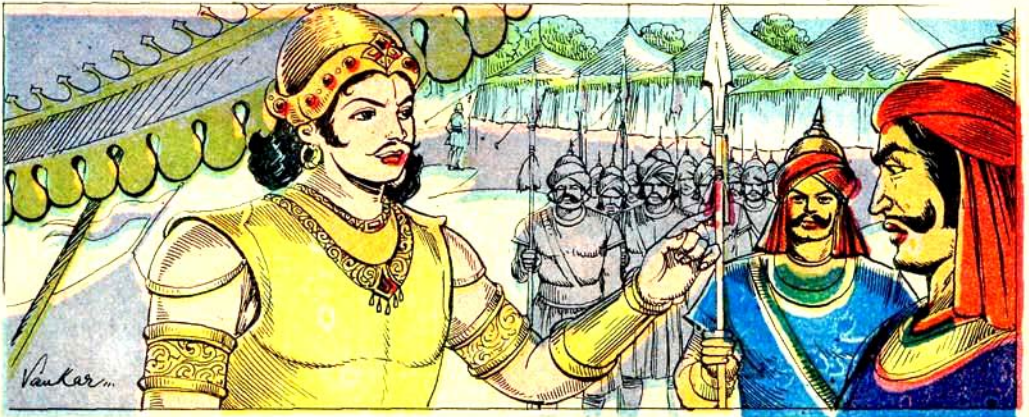
বীর সঙ্গমাইয়া নামে এক সুন্দর স্বাস্থ্য-বান যুবক ছিল শিবের ভক্ত। সে সব সময় শিবের আরাধনা করত।

একবার তার কাকা তার বিয়ের ব্যবস্থা করার জন্য ওঙ্কারপুরে গেল। সেখানে তার এক শ্যালক ছিল। সেও ছিল শিব ভক্ত। টাকা পয়সারও অভাব ছিল না তার। আত্মীয়কে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে তাকে খাইয়ে দাইয়ে বিশ্রামের পর তাকে প্রশ্ন করল, "জামাইবাবু, কি ব্যাপার, না চাইতে বৃষ্টি। কোন দরকারে এসেছেন?"

"হ্যাঁ, একটা শুভ কাজে এসেছি। বীর সঙ্গমাইয়ার বিয়ের বয়স হয়েছে। যোগ্য পাত্রীর সন্ধানে এখানে এসেছি। আমার ধারণা তোমার কন্যা বীর সঙ্গমাইয়ার যোগ্য কনে হবে। তোমার আপত্তি না থাকলে দুজনের বিয়ের ব্যবস্থা করি।" বীর সঙ্গ-মাইয়ার কাকা বলল।

এ কথার জবাবে ঐ শ্যালক খুশী হয়ে বলল, "জামাইবাবু, বীর সঙ্গমাইয়ার চেয়ে ভাল বর আমি আর কোথায় পাব? আপনি মুহূর্ত দেখে বিয়ের ব্যবস্থা করে দিন।" ওরা দুজনে বসে দিনক্ষণ ঠিক করল।

ওঙ্কারপুরের রাজা ভাস্কর একদিন বেড়িয়ে রাজমহলে ফিরছিলেন। তিনি শ্যালকের কন্যা ইন্দ্রানীকে দেখে মুগ্ধ হলেন। রাজা সারা পথ ঐ কন্যার কথা ভাবতে- ভাবতে রাজমহলে ফিরছিলেন।

শেষ প্রচ্ছদ চিত্র

ফিরেই মন্ত্রীদের ডেকে ঐ কন্যাকে বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ভাস্করের মন্ত্রীরা ইন্দ্রাণীর বাড়িতে গিয়ে তার বাবাকে বলল, "মশাই, আপনার ভাগ্যের জোর আছে । আপনার মেয়েকে রাজার পছন্দ হয়েছে। বিয়ে করতে চান তাকে।"

"আপনাদের কথাই ঠিক। আমার পক্ষে সত্যি এটা ভাগ্যের কথা। কিন্তু এখন তো আর তা সম্ভব হচ্ছে না। আমি আমার মেয়ের বিয়ে কার সঙ্গে দেব তা ঠিক করে ফেলেছি। পাত্র ও লগ্ন ঠিক হয়ে আছে।" ইন্দ্রাণীর বাবা বলল।

মন্ত্রীরা ফিরে গিয়ে রাজাকে একথা জানাল। তারপর রাজা নিজের পারিশদ-দের ডেকে বললেন, "ইন্দ্রাণীর সঙ্গে আমার বিয়ের ব্যবস্থা আপনারা যদি না করতে পারেন তাহলে আমি আর বাঁচতে পারব না। আত্মহত্যা করব।"

ওরা সবাই ইন্দ্রাণীর বাবার কাছে গিয়ে তাকে বুঝিয়ে বলল, "আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে? সৌভাগ্যদেবী দরজায় এসে দাঁড়িয়ে আছে আর আপনি তাকে উপেক্ষা করছেন? বিলম্ব না করে রাজার সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ে দিন।"

"অতবড় রাজা আমার জামাই হবেন এর চেয়ে আনন্দের বিষয় আর কি হতে পারে! কিন্তু আপনারা কি চান যে আমি কথার খেলাপ করি? যাকে কথা দিয়েছি তার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করি? এ রকম খারাপ কাজ করলে আপনারাও কি নিন্দা করবেন না?" ইন্দ্রাণীর বাবা জিজ্ঞেস করল।

রাজার লোক রাজার কাছে গিয়ে বলল, "ঐ কন্যার কথা আপনি ভুলে যান। কন্যার বাবা যা বললেন তাতে সত্যি বোঝা যায় তিনি নিরুপায়।"

কিন্তু রাজা অত সহজে ছাড়ার পাত্র নন। তিনি নিজেই ইন্দ্রাণীর বাড়িতে এলেন। ইন্দ্রাণীর বাবা মা ভীষণ ভয় পেল রাজার আগমন দেখে। রাজার সামনে দাঁড়িয়ে বলল ইন্দ্রাণী, "আসুন আসুন, আপনার অশেষ করুণা যে আমার মত

গরিবের বাড়িতে এসেছেন।" এভাবে রাজাকে স্বাগত জানাল।

"তোমার সঙ্গে বিয়ে করার বাসনা নিয়ে এসেছি। আমার সঙ্গে এই ধরণের কথা বলা তোমার কি উচিত হচ্ছে? তোমাকে দেখার মুহূর্ত থেকে অন্য কোন মেয়েকে বউ বলে ভাবতে পারছি না। তোমাকে বিয়ে করতে চাই। সবার উপরে তোমার স্থান করে দিতে চাই।" রাজা বললেন।

"রাজা, যে মুহূর্ত থেকে সঙ্গমাইয়ার সঙ্গে আমার বিয়ে হওয়ার কথা হয়েছে সেই ক্ষণ থেকে আমি তাঁকে বাদে অন্য কাউকে পতি হিসেবে কল্পনা করতে পারছি না। এক নারীর পক্ষে দুজনকে স্বামীরূপে বরণ করা কি সম্ভব?" ইন্দ্রাণী বলল।

"তোমার কাছে নীতি-কথা শুনতে আসিনি।" রাজা বললেন।

ইন্দ্রাণী ভাবল আর বেশি তর্ক করতে গেলে রাজা হয়ত রেগে গিয়ে অবাঞ্ছিত কিছু করতে পারেন। তাই মনে মনে নিজের সমস্ত ভার শিবের উপর অর্পণ করে ইন্দ্রাণী বলল, "ভগবানের যদি ইচ্ছা হয় যে আমি আপনার স্ত্রী হই, তাহলে তাই হবে। তবে আমাদের পরিবারের একটা রীতি আছে। বিয়ের আগে নিষ্ঠার সঙ্গে ঈশ্বরের আরাধনায় বসা। আমি আজই আসনে বসছি। এক সপ্তাহ পরে বিয়ে হতে পারে।"

রাজা প্রসন্ন হয়ে চলে গেলেন। ইন্দ্রাণী বাবা মাকে সবিস্তারে সব কথা জানাল। তারা চিঠি লিখে বীর সঙ্গমাইয়াকে জানাল। সে তার পরিবারের লোকের অনুমতি নিয়ে এল ইন্দ্রাণীর বাড়িতে। গোপনে বিয়ে করে বীর সঙ্গমাইয়া ইন্দ্রাণীকে নিয়ে গেল ঘোড়ায় চড়ে।

গুপ্তচরদের মাধ্যমে রাজা এই খবর পেলেন। ইন্দ্রাণী তাহলে আমাকে ধোকা দিল। রাজা ডেকে পাঠালেন সেপাইদের। বললেন, "তোমরা বীর সঙ্গমাইয়াকে বধ করে ইন্দ্রাণীকে ধরে নিয়ে এস।"

সঙ্গমাইয়া দেখতে পেল রাজার সেপাইরা তার পিছু নিয়েছে। ভাবল সে একা

কিছুই করতে পারবে না। তাই সে ধ্যান করল তার আরাধ্য দেবতা শরভাবতারকে। তৎক্ষণাৎ শরভ আবির্ভূত হয়ে সঙ্গমাইয়ার হাতে একটা মারাত্মক ধরণের আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে বললেন, "এই দিয়ে তুমি শত্রু বধ করতে পার।" বলে তিনি অদৃশ্য হলেন।

বীর সঙ্গমাইয়া নিজের হাতে অমন শক্তিশালী অস্ত্র পেয়ে খুব খুশী হল। তারপর নিষ্ঠুরভাবে রাজার সেপাইদের বধ করল। রাজা অনেক দূর থেকে একটা টিলার উপর দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখে অবাক হলেন।

আক্রমণ করতে করতে হঠাৎ এক শিব-ভক্তকে দেখে তাকে বধ না করে থেমে গিয়ে তাকে প্রণাম করল। তখন রাজা ভাবল শিবভক্তের অভিনয় করে বীর সঙ্গমাইয়াকে বধ করা খুব সহজ হবে। অনেক ভেবে চিন্তে রাজা শিবভক্তের পোশাক পরে পাহাড় থেকে নেমে বীর সঙ্গমাইয়ার কাছে গেলেন। শিবভক্তকে দেখে বীর সঙ্গমাইয়া মাথা নত করে প্রণাম করার সময় মুহূর্তে তরবারি বের করে রাজা তার ঘাড়ে প্রচণ্ড জোরে এক কোপ দিলেন। কিন্তু পরমুহূর্তে দেখা গেল ঐ তরবারি মালা হয়ে বীর সঙ্গমাইয়ার গলায় ঝুলছে!

তক্ষুণি শিব বৃষবাহনে চড়ে এসে বীর সঙ্গমাইয়াকে বর চাইতে বললেন। তৎক্ষনাৎ সঙ্গমাইয়া বর চাইল যাতে সে, তার স্ত্রী ও তার পরিবারের সবাই তাঁর মধ্যে লীন হয়ে যেতে পারে।

"এই রাজা তোমার অপকার করেছে, তাকে কি মুক্তি দেব?" শিবের প্রশ্ন।

"মহাদেব, এই রাজা শিবভক্তের পোশাক ধারণ করে আপনার দর্শন পেয়েছেন, এঁর তো আর কোন পাপ বাকি রইল না। সব পাপ ধুয়ে মুছে গেছে।" সঙ্গমাইয়া বলল। একথায় শিব প্রসন্ন হয়ে সবাইকে নিজের সঙ্গে নিয়ে কৈলাসে গেলেন।

অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসী

পৃথিবীর বহু দেশে এমন বহু মানুষ আছে যারা আজও সেই প্রস্তর যুগের আচার বিচার রক্ষা করে আসছে। অষ্ট্রেলিয়ার একটি অঞ্চলে তিনশো জন আছে। এই অঞ্চলে সাদা মানুষ যেতে পারেনি। এদের জীবনের ধরণ-ধারণ কুড়ি হাজার বছর আগেকার। এই চিত্রে দেখা যাচ্ছে একজন আদিবাসী দেয়ালে ছবি খোদাই করছে।

ফটো : পি. সুন্দরম্
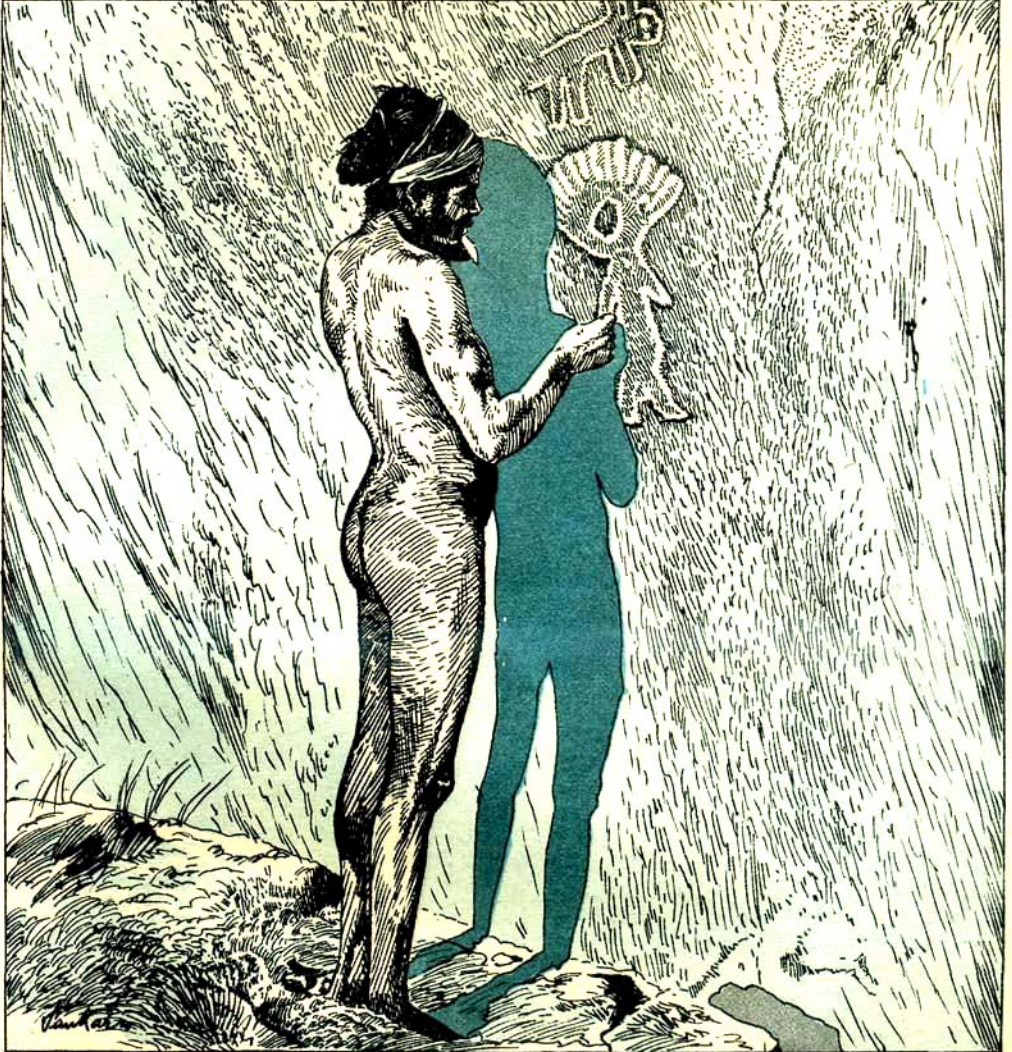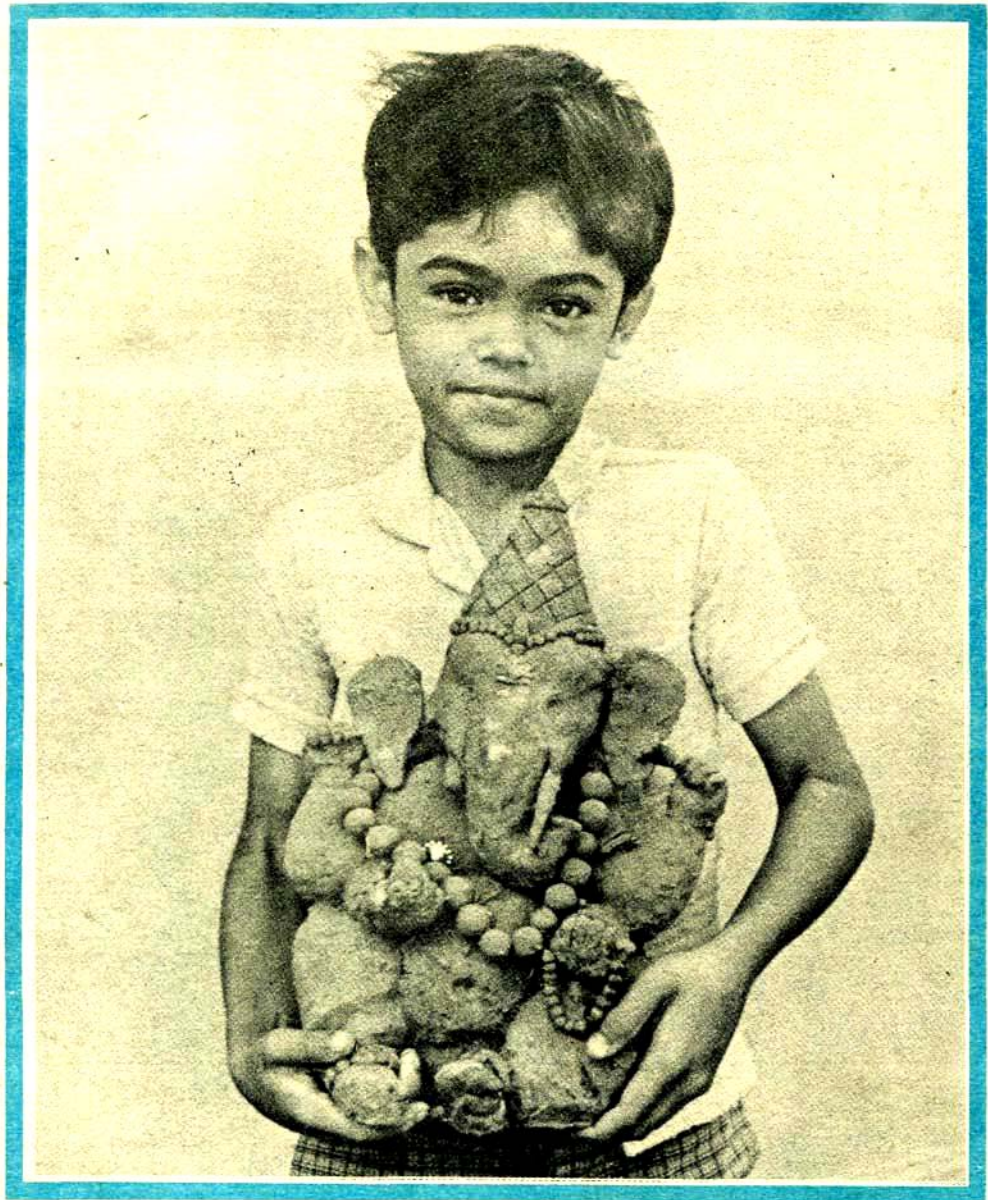
পুরস্কৃত
নাম

স্বষ্টি সুখের উল্লাসে

পুরস্কার পেলেন
পারুল ভট্টাচার্য

ফটো : ডি. এন. শির্কে

বিশ্ব কাঁপে মোর নাচে

৫।৩৭, দমদম রোড,
কলিকাতা-৩০

পুরস্কৃত
নাম

ফটো নামকরণ প্রতিযোগিতা ঃঃ পুরস্কার ২০ টাকা

★

* ফটো-নামকরণ ২০শে অগাস্ট '৭৩-এর মধ্যে পৌঁছানো চাই।
* ফটোর নামকরণ দু চারটি শব্দের মধ্যে হওয়া চাই এবং দুটো ফটোর নামকরণের মধ্যে ছন্দগত মিল থাকা চাই। নিচের ঠিকানায় পোস্ট-কার্ডেই লিখে পাঠাতে হবে। পুরস্কৃত নাম সহ বড় ফটো অক্টোবর '৭৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

চাঁদমামা

এই সংখ্যার কয়েকটি গল্প-সম্ভার

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ চিত্র

রাধা কৃষ্ণের নৃত্য

তৃতীয় প্রচ্ছদ চিত্র

কৃষ্ণ-ভক্তি

Printed by B. V. REDDI at The Prasad Process Private Ltd., and Published by B. VISWANATHA REDDI for Chandamama Publications, 2 & 3, Arcot Road, Madras-26. Controlling Editor: CHAKRAPANI

If you are a Subscriber . . .

We have many thousands of subscribers to CHANDAMAMA magazines, so all the envelopes have to be addressed by the 5th of the preceding month. So, you can see, it is very important that we are informed promptly of any change of address to ensure you receive your copy of the magazine without any delay.

DOLTON AGENCIES
'Chandamama Buildings'
MADRAS-26
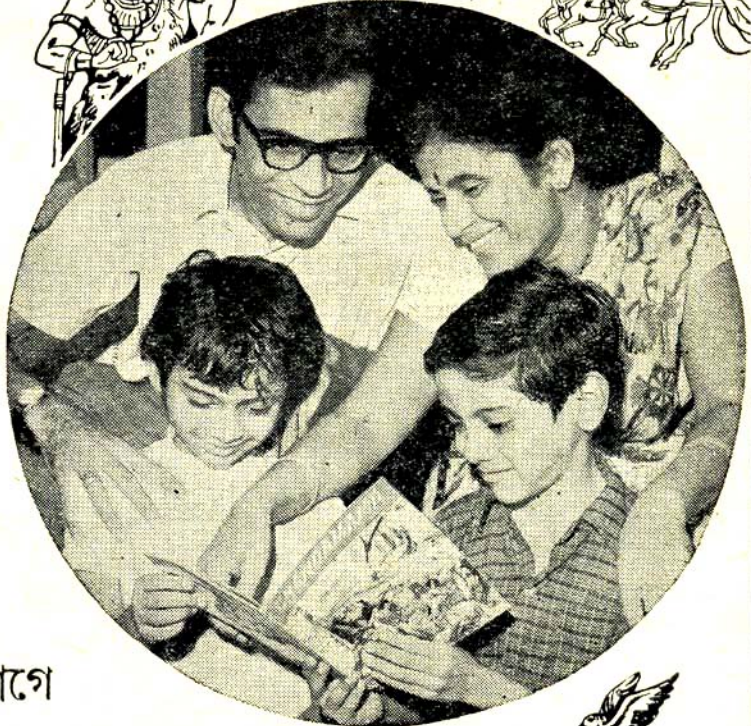
গ্রাহক হবার জন্য যোগাযোগ করুন ঃ ডল্টন এজেন্সীস, চাঁদমামা বিল্ডিংস, মাদ্রাজ-২৬

রঙের ঘটায় রঙের ছটায়
জীবনে আনন্দ ডাক দিয়ে যায়

এসো এসো, সবাই এসো খেয়াল খুশির মজার খেলায় ক্যামলিনের রঙের মেলায়।
মনের মত রঙ ছড়িয়ে ফুটিয়ে তোলো, কল্পনার জল্পনা… আনন্দের আল্পনা!
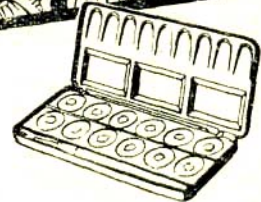
ক্যামেল
আর্ট কালার্স

ক্যামলিন
প্রাইভেট লিমিটেড
জে. বি. নগর,
বোম্বাই ৪০০ ০৫৯ (ভারত)

PRATIBHA 1712-12-BEN F

Photo by: S. G. SESHAGIRY

Vapa